বিশ্বরাজনীতির কথা

ডাঃ তারকনাথ দাস

এম. এ., পি. এইচ. ডি

সরস্বতী লাইব্রেরী

১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বিশ্বরাজনীতির কথা

তারকনাথ দাস

বিশ্বরাজনীতির কথা

[আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা]

ডাঃ তারকনাথ দাস

এম. এ (জর্জ টাউন), পি. এচ-ডি (ওয়াশিংটন)

সুদূর প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যাপক, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অভ্
আমেরিকা ; ম্যুনিখ্ ডয়টশে অ্যাকাডেমীর সম্মানিত
সদস্য ; রোমের মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য
সমিতির সম্মানিত সদস্য

সরস্বতী লাইব্রেরী

১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

বিশ্বরাজনীতির কথা

ডাঃ তারকনাথ দাস

এম. এ., পি. এইচ. ডি

সরস্বতী লাইব্রেরী

১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বিশ্বরাজনীতির কথা

তারকনাথ দাস

বিশ্বরাজনীতির কথা

[আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা]

ডাঃ তারকনাথ দাস

এম. এ (জর্জ টাউন), পি. এচ-ডি (ওয়াশিংটন)

সুদূর প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যাপক, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অভ্ আমেরিকা ; ম্যুনিখ্ ডয়টশে অ্যাকাডেমীর সম্মানিত সদস্য ; রোমের মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য সমিতির সম্মানিত সদস্য

সরস্বতী লাইব্রেরী

১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

মিঃ এন, কে, দত্ত, অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

১৯৩৬

মূল্য এক টাকা আট আনা

শ্রীসুশীলকুমার পুতিতুণ্ড কর্ত্তৃক সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার পিতৃদেব ৺কালীমোহন দাস ও মাতাঠাকুরাণী বিরাজমোহিনী দেবীর স্মৃতিতে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীতারকনাথ দাস

নিবেদন

"বিশ্বরাজনীতির কথা" বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস নহে। এই প্রবন্ধগুলিতে বর্ত্তমান যুগের বিশ্বরাজনীতির চর্চ্চার জন্য মোটামুটি যে জ্ঞান থাকা দরকার, তাহা বাঙ্গালার জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য খুব সংক্ষেপে ও সাদাসিধা ভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। একথা বলা বাহুল্য যে ইহাতে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই এবং কোন কোন বিষয়ে আমার মন্তব্য কাহারও কাহারও মনঃপূত হইবে না; কিন্তু এই পুস্তকখানা যদি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে, বিশেষতঃ ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় বিশ্বরাজনীতির চর্চ্চা বৃদ্ধি করিতে সামান্য সহায়তাও করে তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইবে।

আমি আজ প্রায় ২৮ বৎসর ভারতবর্ষ ছাড়া; কাজেই আমার বাঙ্গালা যে খুব ভাল নয় তাহা জানি। আমার এই মিনতি যে পাঠকেরা ভাবের ও আদর্শের দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাষার ভুল মার্জ্জনা করিবেন। পুস্তকখানি প্রকাশের জন্য আমি সরস্বতী লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

স্যান্ রেমো, ইতালি
১লা নভেম্বর, ১৯৩৩।

শ্রীতারকনাথ দাস

বিশ্বরাজনীতির কথা

[এক]

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিমলায় এক বিশ্বরাজনৈতিক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সদস্য ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, জাপানী গভর্ণমেণ্টের সদস্য ও জাপানী ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি এবং ভারতের ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সদস্য ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ জাপানের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, জাপান ও ভারতের মধ্যে এবং জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে নূতন বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিয়াছেন। ভারতে একটা আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক বৈঠক হইয়াছে এবং ঐ বৈঠকে জাপান ও ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে এক নূতন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ; কাজেই প্রত্যেক শিক্ষিত ভারত-

বাসীর (বিশেষতঃ যাহারা জাপান ও ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের পক্ষপাতী) এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত। এই বৈঠকের পরিণাম যেন ভারতের অকল্যাণকর না হয় এবং এই বৈঠকের ফলে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাহাতে শত্রুতা না জন্মে তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা দরকার। ভবিষ্যতে ভারতবাসীদের বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কাজ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কাজেই বিশ্বরাজনীতির চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। সাধারণভাবে বিশ্বরাজনীতির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও জাপান এবং ভারতবর্ষের সম্পর্কটা কি, এ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাই।

[দুই]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন জাপান অন্যান্য রাজশক্তির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে, তখন জাপানের রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান চিন্তা ছিল যে জাপান যাহাতে ভারতবর্ষ ও চীনের মত বৈদেশিকদের আয়ত্বে না আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানীরা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে ছিল না। ঐ সময় জাপানে চীনের মত অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রথা (Extra-territoriality) বর্ত্তমান ছিল অর্থাৎ জাপানে

বৈদেশিকেরা (শ্বেতাঙ্গ-সমাজের লোকেরা) কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাইত; জাপানের আদালত ও আইন ঐ বৈদেশিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। এই অবস্থায় জাপানের দূরদর্শী নেতারা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি করা দরকার সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তাশীল হন। অনেক চিন্তার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে (ক) একদিকে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ বন্ধ করিয়া জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; (খ) অপর দিকে তাঁহারা স্থির করেন যে পাশ্চাত্য জাতিদের শক্তি কত খানি এবং তাহাদের নিকট কিছু শিখিবার আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ নেতাদের বিদেশে পাঠাইতে হইবে। জাপানের নেতারা পাশ্চাত্য সামরিক প্রথা ও বিজ্ঞানের শক্তি বিষয়ে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া এই স্থির করেন যে জাপানের ভবিষ্যৎ শত্রুদের সামরিক বলের অপেক্ষা নিজেদের সামরিক বল বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন—বিপুল অর্থ ব্যয় হইলেও তাহা অবলম্বন করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপানে বৈদেশিকদের অযথা অধিকার (rights) ও অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সুবিধার (Extra-territoriality) শেষ করিবার জন্য যখনই জাপান চেষ্টা করিত তখনই অধিকাংশ ইউরোপীয় রাজশক্তি, বিশেষতঃ

ইংরাজ ও রুষিয়া, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইংরাজ ও রুষিয়ার জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রধান কারণ ছিল এই যে যদি তাহাদের অধিকার কোন রকমে জাপানে হ্রাস পায় তাহা হইলে চীনেও বৈদেশিকদের অযথা অধিকারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উঠিতে পারে। ঐ সময় জার্ম্মানি ও আমেরিকা জাপানের স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল। জাপান নাচার হইয়া, ফরাসী, আমেরিকান্, জার্ম্মান এবং ইংরাজ অভিজ্ঞদের সাহায্য লইয়া নিজেদের শাসন প্রণালী পাশ্চাত্যধরণে গঠন করে এবং জাপানের সামরিক শক্তি ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে। জাপানীরা ইংরাজের নিকট হইতে নৌযুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করে এবং জার্ম্মানদের নিকট হইতে স্থলসৈন্যের গঠন বিষয়ে শিক্ষা করে। জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য শত শত উপযুক্ত জাপানী বিদেশে শিক্ষার জন্য যায় এবং :জাপানি ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সামরিক পুস্তক অনুবাদ করার বন্দোবস্ত হয়।

[তিন]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা ছিল—ইংরাজ ও রুষের শত্রুতা। ভারতবর্ষে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের পর ইংরাজ বিশ্ব-রাজনীতির লক্ষ্য ছিল যে সুয়েজ খাল হইতে চীন পর্য্যন্ত বিশাল

ভূমিখণ্ডের মধ্যে অন্য কোন ইউরোপীয় রাজশক্তির শক্তি যাহাতে না বাড়িতে পারে। ঐ সময় ইউরোপে রুষিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ফরাসী রাজশক্তি তখন ইন্দোচীন, শ্যাম এবং উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করিতেছিল; এবং রুষিয়া মধ্য এসিয়া হইতে তুর্কি, পারস্য, আফগানিস্থান ও তিব্বতের দিকে এবং চীনের উত্তরে (অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে) রাজ্য বিস্তারে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইংরাজের সহিত অন্য কোন রাজশক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, কাজেই বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে তখন ইংরাজ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ছিল। ঐ সময় ইওরোপে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে আক্রমণ করিতে পারিত, এবং রুষিয়া ইংরাজকে এসিয়ায় (ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে) আক্রমণ করিতে পারিত। কাজেই ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিবিশারদ নেতারা অন্য রাজশক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টিত হয়। ইওরোপে তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মান রাজশক্তিকে ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিল; কাজেই ইংরাজ রাজমন্ত্রী এমন কি স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত ইঙ্গ-জার্ম্মান বন্ধুত্ব সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ সব ইংরাজ রাজনীতি-বিশারদদের মনোভাব এই ছিল যে ইওরোপে হয়ত জার্ম্মানী ইংরাজের হইয়া ফ্রান্স ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। এসিয়াতে তাহারা কয়েকটা রাজশক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব

করিয়া এবং তাহাদের সাহায্য নিয়া তথায় রুষিয়ার প্রসার বন্ধ করিতে চেষ্টিত হয়। এই জন্য একদিকে তুর্কি, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইংরাজ রাজনীতিকেরা অজস্র অর্থব্যয় ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে; অপর দিকে পূর্ব্বে এসিয়াতে চীন কিম্বা জাপানের সঙ্গে তাহারা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ইহার প্রধান কারণ চীন কিম্বা জাপানের সাহায্যে পূর্ব্ব এসিয়াতে রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব করা; এবং এই সমস্ত চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল যেন ভারতবর্ষ অপর কোন রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

জার্ম্মানী ফ্রান্সের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেজন্য ইংরাজের হইয়া রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। কাজেই ইংরাজ রাজনীতিকেরা স্থির করে রুষ-বন্ধু জার্ম্মানির সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনে কোন লাভ নাই। পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ জার্ম্মানিকে ভবিষ্যতের শত্রুর মধ্যে গণ্য করে। যখন ইংরাজ নেতারা বুঝিল যে জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না, তখন তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে প্রয়োজন হইলে ইংরাজ নিজের শক্তিতে বিশেষতঃ নৌ-শক্তির দ্বারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে; তবে যদি রুষিয়া ফ্রান্সের হইয়া সে সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে

করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। অবশ্য ঐ অবস্থায় ভারতীয় জনশক্তি, সামরিক শক্তি ও ধনশক্তি যদি ইংরাজের সাহায্যকল্পে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ইংরাজ অনায়াসে রুষিয়া ও তাহার সহযোগী রাজ-শক্তিদের সমবেত শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে; কিন্তু ইংরাজকে যদি ভারতের উপর সামরিক বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবাসিদের মধ্যে উচ্চ সামরিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজনীতিবিদেরা ভারতবাসীকে কোন প্রকার সামরিক শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিল না; কারণ তাহাদের প্রধান ভয় ছিল যে ভারতবাসিদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তার হইলে তথায় একটা বিদ্রোহ হইতে পারে এবং হয়ত তাহার ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য নষ্ট হইতে পারে। সেজন্য ইংরাজ নেতারা এই স্থির করে যে কোন উপায়ে চীন বা জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া উক্ত রাজশক্তির সাহায্যে রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিবে।

[চার]

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে জাপানীরা যখন তাহাদের দেশ হইতে বৈদেশিকদের অযথা অধিকার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন রুষিয়া ও ইংরাজ উহার বিশেষ বিরুদ্ধে ছিল।

ঐ সময় জাপানের এমন শক্তি ছিল না যে সে ইংরাজ বা রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে জাপানী নেতাদের মধ্যে বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে তিনটি দল ছিল; কিন্তু এ তিনদলের এক বিষয়ে একমত ছিল:— বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপান যদি আত্মরক্ষা করিতে চায় তাহা হইলে, তাহাকে অন্য কোন প্রবল রাজশক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, জাপানের শত্রুর শক্তি নাশ করিয়া নিজের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়িতে হইবে। এই বিষয়ে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও জাপানী রাজনীতিবিশারদদের মধ্যে তিন মত ছিল:— (ক) একদল সিদ্ধান্ত করে যে জাপান চীনের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী; এবং জাপান ও চীনের মধ্যে যদি আন্তরিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে পারা যায় তাহা হইলে চীন ও জাপান সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে; কাজেই এই দলের নেতারা চীনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। এই মতের সমর্থনকারীরা বলে যে যতদিন চীনের বন্দরে পাশ্চাত্য রাজশক্তির বিপুল রণতরী বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন জাপানের নিজের স্বাধীনতা নাশের ভয় থাকিবে। (খ) এই দলের বিরুদ্ধে অন্য দুই দলের নেতারা বলে যে প্রথমতঃ চীন নিজের স্বার্থরক্ষা করিতে সমর্থ নয়; কাজেই চীন জাপানকে সাহায্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ তাহারা জানিত যে চীনের নেতারা অন্তরে অন্তরে জাপানের বিরুদ্ধে ছিল; কাজেই দুর্ব্বল ও প্রকৃত বন্ধুবিহীন

চীনের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি করিয়া, জাপান কোন শক্তিশালী পাশ্চাত্য রাজশক্তির সহিত (যথা রুষিয়া বা ইংলণ্ডের সহিত) যুদ্ধ করিলে নিজের স্বাধীনতা হারাইতে পারে। কাজেই জাপানের নূতন নেতাদের মধ্যে এই পন্থা স্থির হয়ঃ— (ক) জাপান রুষিয়া বা ইংলণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে, এবং (খ) জাপানের আত্মরক্ষার জন্য যাহাতে কোরিয়া কোনক্রমে জাপানের ভবিষ্যৎ শত্রুর হাতে না পড়ে তাহার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিবে।

কোরিয়ায় জাপান নিম্নলিখিত কারণে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হয়—জাপানের বিশ্ব রাজনীতিবিশারদেরা বুঝিয়াছিলেন যে (১) জাপান যদি রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করে, তাহা হইলে ইংরাজ চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে ; এবং তাহার ফলে ইংরাজ ও চীনের সম্মিলিতশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। (২) জাপান যদি ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাহা হইলে চীন ও রুষিয়ার সম্মিলিত শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই কোরিয়ার মধ্য দিয়া চীনের ও রুষিয়ার শক্তি জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে। কাজেই জাপান যদি কোরিয়াতে নিজের শক্তি সুদৃঢ় করিতে পারে, তাহা হইলে কোরিয়াতে যুদ্ধের কেন্দ্র (base) স্থাপন করিয়া, দরকার হইলে চীন বা রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে। শুধু তাই নয়, যদি চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বের ফলে বা ইংরাজ জাপানের

বন্ধুত্বের ফলে এই স্থির হয় যে তাহারা উভয়ে কিম্বা জাপান একাকী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে তাহা হইলে জাপানকে কোরিয়া হইতেই যুদ্ধ করিতে হইবে। কাজেই কোরিয়া রুষিয়ার হাতে পড়িলে জাপানের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ভয় ছিল। এই কারণে জাপানের পূর্ব্বোক্ত তিন দলের নেতারা এই স্থির করে যে জাপান চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোরিয়াতে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

চীনের নেতাদের মধ্যে জাতীয় উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়াস ছিল না। তাহারা মনে করিত যে এক "বর্ব্বর শক্তির" সঙ্গে অপর একদল "বর্ব্বর শক্তির" শত্রুতা লাগাইয়া বিনা প্রয়াসে চীন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের নেতা ও বিশ্বরাজনীতিবিশারদদের মধ্যে স্বর্গীয় লি হুং চ্যাঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তিনি স্থির করেন যে চীন রুষিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া জাপানের শক্তি খর্ব্ব করিবে। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে চীন যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রুষিয়ার সাহায্য পায়, তাহা হইলে অনায়াসে জাপানকে পরাজিত করিতে পারিবে; এবং পরে নিজ শক্তিতে ও রুষিয়ার সাহায্যে ইংরাজকে চীন হইতে তাড়াইতে পারিবে। লি হুং চ্যাঙ্গ ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন। চীনে "তাই পিং" বিপ্লব দমনের জন্য ইংরাজ মাঞ্চু রাজশক্তিকে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং ঐ সময় হইতে লি হুং চ্যাঙ্গ যাহাতে ইংরাজের প্রতিপত্তি চীনে না বাড়িতে পারে তাহার জন্য বদ্ধ-

পরিকর হন। শুধু তাই নয়; লি হুং চ্যাঙ্গ রুষিয়ার তরফ হইতে অনেক টাকা ঘুষ লইয়া ইংরাজ ও জাপানের বিরুদ্ধে চীনের বিশ্বরাজনৈতিকপন্থা নিয়ন্ত্রিত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে আজ পর্য্যন্ত জাপানের বিশ্বরাজনীতির মূল লক্ষ্য এই:—যে কোন উপায়ে জাপানকে এবং যদি সম্ভব হয় সমস্ত এশিয়াকে পাশ্চাত্য রাজশক্তির আধিপত্যের হাত হইতে উদ্ধার করা; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চীনের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাহায্য দরকার। তবে চীন যদি জাপানের আদর্শের বিরুদ্ধে যায় এবং জাপানের সহিত মিলিত হইয়া "স্বাধীন এশিয়া"র আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে না দেয়, তাহা হইলে জাপান অন্য রাজশক্তির সাহায্যে এবং সুযোগমত ধীরে ধীরে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইবে না।

[পাঁচ]

চীন যে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল না তাহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল চীন-জাপানের যুদ্ধে। ইহার ফলে জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া লাইটুং উপদ্বীপে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে, ফরমোসা দ্বীপ অধিকার করে এবং চীনের নিকট হইতে এক ক্রোরের অধিক টাকা যুদ্ধের খেসারত বাবদ আদায় করে। চীন জাপানের

যুদ্ধের ফলে কোরিয়াকে চীনের হাত হইতে স্বাধীন করা হয়; কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম—কোরিয়া হইতে চীনের প্রভাব নাশ এবং তৎপরিবর্ত্তে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি। জাপানের এই জয়ের ফল প্রথম সিমোনোসেকি সন্ধি (এপ্রিল ১৭, ১৮১৫)।

প্রথম সিমোনোসাকি সন্ধির পর, চীন যদিও জাপানকে জয়ের ফল ভোগ করিতে দিতে রাজি হয় কিন্তু লি হুং চ্যাঙ্গ চীনের তরফ হইতে যাহাতে অন্য রাজশক্তির সাহায্যে জাপানের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে পারেন তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হন।

চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা মহাবিপ্লব আনিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক ইংরাজনেতার ধারণা ছিল যে হয়ত চীনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া চীনের সাহায্যে রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিবে; কিন্তু যখন ক্ষুদ্র জাপান চীনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় তখন ইংরাজ নেতা ও রাজনীতিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে উন্নতিশীল ও শক্তিমান্ জাপানের সাহায্যে হয়ত একদিন রুষিয়ার শক্তি তাহারা নাশ করিতে পারিবে; অপর দিকে জাপানের জয়ের ফলে কোরিয়াতে জাপানের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, রুষিয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। চীন-জাপানের যুদ্ধের পূর্ব্বে রুষিয়া স্থির করিয়াছিল যে কয়েক বৎসর পরে সে কোরিয়াকে গ্রাস করিবে; কিন্তু কোরিয়াতে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় রুষিয়ার পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং রুষ-

জাপান শত্রুতার সূত্রপাত হয়। প্রথম সিমোনোসেকি সন্ধির পর যখন লি হুং চ্যাঙ্গ গুপ্তভাবে জাপানের বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাজশক্তির সাহায্য খুঁজিতেছিলেন, তখন রুষিয়া অতি আনন্দসহকারে চীনকে টাকা ধার দিতে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে রুষিয়া নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্যই পূর্ব্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করে। চীন ও রুষিয়ার মধ্যে এক গুপ্ত সন্ধির ফলে এই স্থির হয় যে রুষিয়া জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সাহায্য করিবে এবং চীন রুষিয়াকে লিয়াও-টুং (Liao-tung) উপদ্বীপ (যাহা প্রথম সিমোনোসেকি সন্ধির ফলে জাপানের হস্তগত হয়) ৯৯ বৎসরের জন্য খাস মৌরসী সত্ত্বে দিবে।

এই গুপ্ত সন্ধির ফলে রুষিয়া ও তাহার বন্ধু ফ্রান্স এবং জার্ম্মানি একত্র হইয়া জাপানের উপর এই দাবী করে যে "বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের জন্য", জাপান প্রথম সিমোনোসেকি সন্ধি অনুযায়ী যে সমস্ত জমি এশিয়া মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডে (অর্থাৎ চীনে) দখল করিয়াছে তাহা চীনকে ফেরত দিতে হইবে। রুষিয়া, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের এই অনুরোধের প্রকৃত মর্ম্ম ছিল যে যদি জাপান স্বেচ্ছায় লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফেরত না দেয় তাহা হইলে জোর করিয়া জাপানকে ঐ প্রদেশ হইতে তাড়ান হইবে। কাজেই এই অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে রুষিয়ার, ফ্রান্সের ও জার্ম্মানীর রণতরী প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নিকট একত্রিত হয়। জাপানের

পক্ষে এই অনুরোধ পালন করা বিশেষ লজ্জাজনক ; কিন্তু জাপানের নেতারা জানিতেন যে যদি জাপান এই অনুরোধ অমান্য করে তাহা হইলে রুষিয়া, চীন, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং ঐ যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ফলে জাপানের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাশ হইতে পরে। কাজেই জাপান চীনকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ফেরত দেয় এবং তজ্জন্য দ্বিতীয় সিমোনো-সেকি সন্ধি স্বাক্ষর করে।

[ছয়]

সিমোনোসেকির দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরের পর জাপানের নেতারা ও বিশ্বরাজনীতিবিশারদদের মধ্যে এই চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয় যে যে-কোন উপায়ে জাপানকে একটী কোন রাজশক্তির সহিত বন্ধুত্বের সন্ধি করিতে হইবে। যখন রুষিয়া, জার্ম্মানী ও ফ্রান্স একত্র হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখন জাপানের নেতারা ভাবিয়াছিলেন যে হয়ত ইংরাজ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানের পক্ষ অবলম্বন করিবে। ইংরাজ ও আমেরিকা যদিও চীনে রুষিয়ার শক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু তাহারা জাপানকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল না; কারণ উহার ফলে চীনে ইংরাজ ও আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ প্রবল হইতে পারিত। শুধু তাই নয়, যদি রুষিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও চীন একত্র হইয়া

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য ইংরাজ ও আমেরিকাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইত অথচ সে সময় ইংরাজ ও আমেরিকা জাপানের হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না।

এই সময় জাপানের বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটী দল হয়। এক দলের আদর্শ ছিল যে জাপানকে কোন উপায়ে রুষিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে হইবে; রুষ-জাপানে বন্ধুত্ব স্থাপন হইলে হয়ত ফ্রান্স ও জার্ম্মানী তাহাদের সহিত যোগ দিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাপানের একদলের নেতাদের রুষিয়া মাঞ্চুরিয়ার একাংশ দখল করিলেও আপত্তি ছিল না; অবশ্য জাপান ঐ সময় কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার অপরাংশ নিজের হস্তগত করিবে। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে জাপান রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বিনা যুদ্ধে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে পারিবে। এই দলের নেতাদের মধ্যে ছিলেন মার্কুইস্ ইতো (পরে প্রিন্স ইতো) এবং জাপানের সামরিক নেতৃবৃন্দ। এই দলের বিরুদ্ধে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মত ছিল, রুষিয়ার সঙ্গে জাপানের একদিন যুদ্ধ করিতে হইবেই হইবে; কারণ রুষিয়া জাপানকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে এবং স্বেচ্ছায় রুষিয়া কখন জাপানের সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত হইবে না। শুধু তাই নয়, জাপান যদি ইংলণ্ডের সাহায্যে রুষিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে তাহা হইলে জাপানের মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান বাড়িবে এবং তাহা হইলে

হয়ত চীন জাপানের বিরুদ্ধে না গিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে যত্ন করিবে। জাপানের নৌ-বিভাগের নেতারা এই দলের অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং ব্যারণ হায়াসি ও ব্যারণ কাতো এই দলের নেতা ছিলেন।

দ্বিতীয় সিমনোসেকি সন্ধির পরই পাশ্চাত্য রাজশক্তিগুলি চীনের বিভিন্ন প্রদেশে ৯৯ বৎসরের জন্য পাকা মৌরসী পাট্টা লইতে আরম্ভ করে। এই ব্যাপারে যে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ জাপান চীনকে ফেরত দেয় তাহা রুষিয়া দখল করে এবং পোর্ট আর্থার বন্দরে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ স্থাপন করে। তখন জাপানের দেশভক্তদের মধ্যে এই মত প্রবল হয় যে যথা-সময়ে জাপান রুষিয়াকে এমন শিক্ষা দিবে যে তাহা সে কখন ভুলিবে না; এবং একদিন রুষিয়াকে পরাজিত করিয়া লিয়াও-টুং উপদ্বীপ দখল করিবে; আর মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষিয়ার প্রতিপত্তি দূর করিবে। কাজেই রুষিয়াকে দমন করিবার জন্য জাপানের ও ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব দরকার এবং পরে ইংরাজ-জাপানের বন্ধুত্বের পন্থা জয়লাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর পাশ্চাত্য রাজশক্তিগণ চীনের বিভিন্ন অংশে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে থাকে। রুষিয়া মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে, ইংরাজ ইয়াংসি নদীর উপকূলস্থ প্রদেশে (the region of the Yangtse Valley) নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করে এবং ওয়েই হাই-উই বন্দর দখল করে;

জার্ম্মানী সানটুং প্রদেশের সিংতাও বন্দর লয় এবং সমস্ত সানটুং প্রদেশে তাহার প্রতিপত্তি বিস্তারের অধিকার (Sphere of influence) লয়; ফ্রান্স দক্ষিণ চীনে ইউনান্ প্রদেশে তাহার প্রতিপত্তি বিস্তারের বন্দোবস্ত করে। ইহার ফলে চীনের জনসাধারণ বিদ্রোহ আরম্ভ করে; ইহাই বক্সার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে চীনস্থ বৈদেশিকদের উপর আক্রমণ হয়। তাহার ফলে বিভিন্ন রাজশক্তির সৈন্য-দল—ইংরাজ, ফরাসী, রুষিয়া, জার্ম্মানী, ইতালি, জাপান ও আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে পিকিনের দিকে অগ্রসর হয় এবং পিকিন অবরোধ করে। বক্সার বিদ্রোহের সময় জাপান অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী উপস্থিত করে। জাপানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে যদি প্রয়োজন হয় ঐ সৈন্যবাহিনী রুষিয়া কর্ত্তৃক চীনের উত্তর প্রদেশ ও মাঞ্চুরিয়া দখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। ঐ সময় জাপান জানিত যে ইংরাজ ও আমেরিকা রুষিয়ার চীনের উত্তর প্রদেশ ও মাঞ্চুরিয়া দখলের বিরুদ্ধে ছিল; কাজেই উক্ত সমস্যা লইয়া যদি জাপান ও রুষিয়ায় যুদ্ধ ঘটিত তাহাতে জাপানের বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল না।

বক্সার বিদ্রোহ শেষ হইলে স্থির হয় যে প্রত্যেক বিদেশী রাজশক্তি তাহাদের সৈন্যদল চীন হইতে সড়াইয়া লইবে, কেবল অল্প সংখ্যক সৈন্য স্ব স্ব দেশীয় রাজ-প্রতিনিধিদের আবাস স্থান ইত্যাদি রক্ষার জন্য থাকিবে।

এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও রুষিয়া যখন তাহার সৈন্যদল মাঞ্চুরিয়া হইতে অপসারিত করিতে অস্বীকৃত হয় তখন জাপান তীব্র আপত্তি করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের অবস্থা এই যে শুধু রুষিয়ার সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য সে পশ্চাৎপদ নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (বক্সার বিদ্রোহ দমনের পর) জাপান এমন শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিল যে ইংরাজ বিশ্বরাজ-নীতি-বিশারদেরা এবং সামরিক ও নৌ-বাহিনীর নেতাদের প্রতীতি হয় যে জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে ইংরাজের লাভ বই লোকসানের আশঙ্কা নাই। কাজেই জাপানীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুফল ফলে এবং ইঙ্গ-জাপান ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসে জাপানের সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধিটা, এসিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি বিশেষ লাভ। এই সন্ধির ফলেই ইংরাজ জাপানের হইয়া রুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হয়।

এই সন্ধি স্থাপন সম্পর্কে অনেক ইংরাজ রাজনীতির কর্ণধারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে জাপান রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহার শক্তি ক্ষয় করিবে। তবে ইংরাজ ইঙ্গ-জাপানী মিত্রতার ফলে রাজি হয় যে জাপান যদি রুষিয়ার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং ঐ সময় যদি অন্য কোন রাজশক্তি রুষিয়ার পক্ষ হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা

হইলে ইংরাজ খোলাখুলি জাপানের হইয়া যুদ্ধ করিবে ; এবং যদি ইংরাজ জাপানের হইয়া যুদ্ধ করে তাহা হইলে এই দুই রাজশক্তি কখনও বিভিন্ন সন্ধির দ্বারা যুদ্ধ শেষ করিবে না। জাপান ইংরাজের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি করিয়া বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে 'জাতে' উঠে ; ইহার পূর্ব্বে জাপান একঘরে হইয়া ছিল ; কাজেই তাহার শক্তিও কম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন চীন জাপানের যুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধে জাপান চীনকে পরাজিত করে তখন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (বক্সার বিদ্রোহের পর) জাপান যখন ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি করে তখন হইতে তাহার অবস্থা উন্নতি লাভ করে। ইহার পর হইতে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রের সকল প্রধান ঘটনায় জাপান আপনার প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়া গিয়াছে—কোন রাজশক্তি আর জাপানকে নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে সাহস করে নাই।

[সাত]

ইঙ্গ-জাপান সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর, রুষ জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ ছিল না। রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয় ; তথাপি এই সঙ্গে কয়েকটা বিশ্বরাজনীতির কথা না বলিলে চলে না।

১। ইংরাজ ও জাপানের সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে, রুষ জাপানের যুদ্ধে যদি ফ্রান্স বা অন্য রাজশক্তি রুষিয়ার হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহা হইলে ইংরাজকে জাপানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে হইবে। কাজেই ইংরাজের প্রধান চিন্তা হয় যাহাতে রুষ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে না পারে; এবং স্থির করে তাহা হইলে, জাপানী সৈন্য ভারতে আনিয়া রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে। এইজন্য জাপানী সেনানায়কগণ ও ইংরাজের ভারতস্থ সেনানায়কদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং জাপানী সেনানায়কেরা ভারতের (বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের) দুর্গাদি পরীক্ষা করে। রুষ জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়ে এবং রুষিয়ার পরাজয়ে যে ইংরাজের সমূহ লাভ হইবে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ ছিল না; কাজেই ইংরাজ জাপানকে নানা ভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়। তার মধ্যে একটা প্রধান কথা যে ইংরাজ জাপানকে ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়।*

২। ইংরাজ জাপানকে টাকা ধার দেয়; ঐ টাকা দিয়া জাপান যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতে থাকে। ইংরাজ জাপানকে অস্ত্রশস্ত্রবিক্রয় করিয়াও বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

---

* অনেক ইংরাজ রাজনীতিকেরা বর্ত্তমানে জাপানের সাহায্যাপেক্ষী নয় তাই ঐ ব্যবসামূলক সন্ধি রদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

৩। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় রুষিয়া তাহার নৌ-বাহিনী বল্‌টিক সাগর হইতে জাপান সাগরে আনিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আয়োজন করে। যখন রুষিয়ার নৌ-বাহিনী ইংলণ্ডের কূলে আসে তখন রুষিয়ার রণতরীগুলি কয়েকটা ইংরাজের মাছধরার নৌকাকে, জাপানী টরপেডো বোট (torpedo boat) মনে করিয়া, আক্রমণ করে। ইহার ফলে ইংরাজ ও রুষিয়ায় যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়; কেবল ফ্রান্সের বিশেষ চেষ্টার ফলে ইংরাজ রুষিয়ার এই ঝগড়া আপোষে মিটমাট হইয়া যায়। এখন কথা উঠিতে পারে যে এ বিষয়ে ফ্রান্সের এত আগ্রহ ছিল কেন? তাহার উত্তর এই ঃ—ফ্রান্স রুষিয়ার সহিত এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল যে ইউরোপে যদি কোন শক্তি রুষিয়াকে আক্রমণ করে তাহা হইলে ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া রুষিয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যদি ইংরাজ-রুষিয়ায় যুদ্ধ বাধিত তাহা হইলে ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত; কিন্তু ঐ সময় ফ্রান্সের নেতারা জানিত যে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল; হয়ত জার্ম্মানী ঐ সময় ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে পারিত। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় ইংরাজ যেমন অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ও অর্থ ধার দিয়া জাপানকে সাহায্য করে, ফ্রান্সও ঐভাবে রুষিয়াকে বিশেষ করিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

৪। জার্ম্মানী রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপান ও রুষিয়া উভয়কেই অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিয়া লাভ করে। জার্ম্মানীর সম্রাট উইলহেল্‌ম্‌ জাপানের বিরুদ্ধে ছিলেন (তিনিই Yellow Peril idea প্রচার করেন) এবং রুষিয়ার বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষিয়ার শক্তি-ক্ষয়ে জার্ম্মানীর কোন আপত্তি ছিল না, কারণ রুষিয়া ও ফ্রান্সের সন্ধির দ্বারা ইহা স্থির ছিল যে হয়ত কোনদিন ফ্রান্স ও রুষিয়া উভয়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে। জার্ম্মানী একদিকে রুষিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে খুব জোরে যুদ্ধ চালাইতে উৎসাহিত করিতে থাকে এবং অপরদিকে জাপানকে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে থাকে।

৫। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সহানুভূতি জাপানের দিকে ছিল। প্রথমতঃ আমেরিকার জনসাধারণ রুষিয়ার জারের অত্যাচারমূলক শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে ছিল; তারপর যদি রুষিয়া জাপানকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়া হস্তগত করিত তাহা হইলে মাঞ্চুরিয়াতে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের সুবিধা কমিয়া যাইত; এবং রুষিয়া ধীরে ধীরে উত্তর চীনের পিকিন পর্য্যন্ত দখল করিতে পারিত এবং তাহাতে আমেরিকার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এই সঙ্গে একথা মনে রাখা উচিত যে বক্সার বিদ্রোহের পর যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি চীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভাগ করিয়া নিজেদের রাজত্ব বিস্তারের জন্য

ব্যস্ত ছিল তখন আমেরিকা চীনে ব্যবসা বাণিজ্যে স্বাধীনতা প্রথা (Open Door Policy) প্রচলনের জন্য প্রস্তাব করে। ইংরাজ ও জাপান এ বিষয়ে আমেরিকাকে পূর্ণ সহানুভূতি জানায় কিন্তু রুষিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। কাজেই রুষ জাপান যুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট থিয়োডর রুস্‌ভেল্ট মনে মনে রুষিয়ার বিরুদ্ধে এবং ইংরাজের স্বপক্ষে ছিলেন ; কাজেই তিনি ইংরাজের সাহায্যের জন্য জাপানের পক্ষপাতী হন। তারপর আমেরিকাস্থ ধনী ইহুদীদল রুষিয়ার বিরুদ্ধে ছিল ; কারণ রুষিয়ার জারের রাজত্বকালে ইহুদীদের উপর ভীষণ অত্যাচার হইত। রুষিয়ার পরাজয়ের ফলে হয়ত ঐ দেশে উদার-পন্থী শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, এ আশা অনেকের মনে ছিল। যদিও আমেরিকা খোলাখুলি ভাবে জাপানকে সাহায্য করে নাই, তথাপি টাকা ধার দিয়া বিশেষ উপকার করে।

৬। বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধে লোকের গায়ের জোরের পরিচয় দিবার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায় না। একালের যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক সামরিক প্রথা, অর্থবল, শিল্পবাণিজ্যবল, পীড়িত সৈন্যদের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা জয় লাভ করা সম্ভব। জাপান রুষিয়াকে যুদ্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত করে ; তাহার প্রধান কারণ জাপানের জনশক্তি

জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু রুষিয়ায় জনসাধারণের মধ্যে সে রূপ উৎসাহ ছিল না, অধিকাংশ রুষসৈন্যই অনিচ্ছায় যুদ্ধে যায়। রুষিয়ার জাতীয়তাবাদীরাও যাহাতে রুষিয়ার পরাজয় হয় তাহার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছিল। একথা হয়ত সাধারণ লোকের অজ্ঞাত যে জাপান রুষিয়ায় বিপ্লব আনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিল।

৭। গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে (World War) যেরূপ প্রথমে জার্ম্মানীর জয় হইতে থাকে কিন্তু চার বৎসরের পর জার্ম্মানীর পরাজয় হয়, ঠিক সেইভাবে জাপান প্রথমে সর্ব্ব যুদ্ধে জয়ী হয়। কিন্তু যত সময় যাইতে লাগিল, রুষিয়ার সৈন্যদল আপনাদের দেশের দিকে পশ্চাদ্‌পদ হইতে থাকে কাজেই জাপানের পক্ষে দূরে শত্রুর দেশে যুদ্ধ করিতে যাওয়া কষ্টকর ও বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। যখন জাপানের পক্ষে এই সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজের প্ররোচনায় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুস্‌ভেল্ট এই যুদ্ধ মিট্‌মাট করিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার ফলে রুষ-জাপান যুদ্ধ পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি দ্বারা শেষ হয়। এই সন্ধির ফলে জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপে আপনার প্রতিপত্তি পুনরায় স্থাপন করে—দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ান্ রেলওয়ে, যাহা রুষিয়ার ছিল, তাহা দখল করে এবং সাগালিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণভাগ (অর্দ্ধেক) ফেরত পায়। যদিও রুষিয়া যুদ্ধে

পরাজিত হয় তথাপি জাপানকে যুদ্ধের খরচ বাবদ এক পয়সা দেয় না।

৮। রুষ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয় সহজে হয় নাই। অন্ততঃ এক লক্ষ জাপানী সৈন্য এই স্বাধীনতা সমরে জীবন দেয়। জাপান এই যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা খরচ করে। জাপান যে আজ মাঞ্চুরিয়াতে আত্মশক্তি বিস্তার করিতেছে তাহার ভিত্তি এক লক্ষ জাপানী দেশভক্তের অস্থির উপর গঠিত হইয়াছে। তারপর একথা যেন মনে থাকে যে জাপানী নৌ-বাহিনী রণকৌশলে জগতকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। জাপান টরপেডো দিয়া এবং সম্মুখ জলযুদ্ধে রুষিয়ার নৌ-বাহিনীকে একেবারে ধ্বংস করে। জাপানী নৌ-বাহিনীর নেতা অ্যাড্‌মিরাল তোগো ও তাহার সহকারীরা তপস্বীর মত কাজ করে। রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের কারণের মধ্যে, চৈনিক, কোরিয়ান এমন কি ভারতবাসিদের সহানুভূতিকেও গুণিতে হয়। যদিও চৈনিক গভর্ণমেণ্ট জাপানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিল তথাপি চৈনিক জন-সাধারণ এবং লক্ষ লক্ষ কুলী মজুর জাপানের পক্ষপাতী ছিল; কারণ সে সময় চীনে পাশ্চাত্য বিদ্বেষের প্রবল স্রোত চলিতেছিল। সমগ্র ভারতেও এ সময় জাপানের প্রতি প্রবল সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল।

৯। জাপান যদিও রুষিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে, তথাপি রুষিয়ার নিকট হইতে যুদ্ধের খরচ বাবদ কোন টাকা

পায় নাই কেন ? ইংরাজ ও আমেরিকার বহু রাজনীতিকেরা জাপানের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেও জাপান যে হঠাৎ খুব শক্তিশালী হয় তাহা তাহারা চাহে নাই ; কারণ প্রবল শক্তি-শালী জাপান আমেরিকার অধীনস্থ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করিতে পারে এবং ইংরাজকে চীন হইতে তাড়াইতে পারে। জাপানের জয়ের ফলে সমস্ত এশিয়াতে যে একটা নূতন জাতীয়ভাবের অভ্যুত্থান হয় উহা যে কোন পাশ্চাত্য রাজ-শক্তির মনঃপূত ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই যেমন চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয় সত্ত্বেও কতিপয় পাশ্চাত্য রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণে জাপান জয়ের পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারে নাই ঠিক সেইভাবে জাপান রুষ-জাপান যুদ্ধেরও পূর্ণ ফল পায় নাই। সে যাহা হউক রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের ফলে "স্বাধীন এশিয়া" আন্দোলনে এক যুগান্তর আনয়ন করে।

[আট]

রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের ফলে, ইংরাজ পুনরায় জাপানের সঙ্গে এক সন্ধি পত্র (alliance) স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হয় যে যদি কোন রাজশক্তি জাপানকে আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংরাজ জাপানকে সাহায্য করিবে এবং যদি কোন রাজশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

কোন অংশ আক্রমণ করে তাহা হইলে জাপান ইংরাজকে সাহায্য করিবে। অনেকের মতে, এই সন্ধির ফলে জাপান গুপ্ত-ভাবে ইংরাজের সঙ্গে এই চুক্তি করে যে ভারতবর্ষ যদি কোন বৈদেশিক শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় বা ভারতে যদি কোন প্রকার বিদ্রোহ হয় তাহা হইলে জাপান ইংরাজকে সাহায্য করিবে; এবং ইংরাজ রাজি হয় যে জাপান যদি কোরিয়াকে নিজের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাহাতে ইংরাজ কোন আপত্তি করিবে না। এই সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুস্‌ভেল্ট জাপানের সঙ্গে এই চুক্তি করেন যে জাপান যদি ফিলিপাইনে আমেরিকার আধিপত্যের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় এবং যদি জাপানী শ্রমিক আমেরিকায় না আসে তাহার বন্দোবস্ত করে তাহা হইলে জাপান কোরিয়া দখল করিলে, আমেরিকা তাহাতে বাধা দিবে না। জাপান এই সময় রুষিয়ার সঙ্গেও একটা গুপ্ত সন্ধি করে। রুষিয়া রাজি হয় যে জাপান কোরিয়া দখল করিতে পারে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে তাহার প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে; এবং জাপান রাজি হয় যে জাপান উত্তর মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে রুষিয়ার প্রতিপত্তি বিস্তারে বাধা দিবে না। ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীও জাপানের কোরিয়া দখলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে নাই।

যাঁহারা বিশ্বরাজনীতির ভিতরের কথা ভাল করিয়া জানেন না, তাঁহারা বলেন যে জাপানের রাজ্যবিস্তার

পন্থার ফলে কোরিয়ার স্বাধীনতা নাশ হয়। এবিষয়ে প্রকৃত কথা হইতেছে এই :—কোরিয়ার দৌর্ব্বল্যে অন্যান্য রাজশক্তি কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে সাহায্য করে—কাজেই জাপান বাধ্য হইয়া কোরিয়া দখল করে। যদি ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুষিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী, জাপানের কোরিয়া দখলের অনুমোদন না করিত তাহা হইলে জাপান একলা সমস্ত পৃথিবীর প্রধান রাজশক্তিগুলির বিরুদ্ধে কোরিয়া দখল করিতে পারিত না। এ বিষয়ে জাপানকে গালি দিলে ও দোষী করিলে কোরিয়ার স্বাধীনতা নাশের গূঢ় মর্ম্ম বুঝা সম্ভব নয়।

রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে, রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব হইলে ইংরাজ তিব্বতে এক অভিযান পাঠায় এবং সেখানে যাহাতে রুষিয়ার বা চীনের শক্তি প্রসারিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করে। ইহাই ইংরাজের সাহায্যের মূল্য।—জাপান কোরিয়া দখল করিবে এবং ইংরাজ তিব্বতে আত্মশক্তি বিস্তারের বন্দোবস্ত করিবে। শুধু তাই নয়, ইংরাজ আফগানিস্থানে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াইবার বন্দোবস্ত করে এবং দক্ষিণ পারস্যেও ইংরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে সমগ্র এসিয়াতে একটা নূতন জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রয়াস আসে। ভারতবর্ষেও ইহার উন্মাদনা নানাবিধ জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট

সম্প্রদায় জাপানে যাইতে আরম্ভ করে। তাহারা ১৯০৫-৬ সালে জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যত্ন করে। সাধারণ ভারতবাসীরা একথা বুঝেন না; কিন্তু প্রকৃত সত্য ইংরাজ রাজনীতিকেরা বুঝিয়াছিল যে ভারতে নূতন জাতীয় আন্দোলনের একটা নূতন সহায় আসিয়াছে। বাঙ্গালার জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন বহু ইংরেজ রাজনীতিক তাই ভারতীয় মডারেটদের উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। এবং সেই জন্যই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন। বিশ্বরাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের সহিত ভারতে মর্লি-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্ত্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত

রুষ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়ের ফলে সমস্ত এসিয়ায় একটা নবজাগরণের সাড়া পড়ে। তুর্কির বিপ্লব, চৈনিক বিপ্লব, পারস্যে বিপ্লব, শ্যামের নব-জাগরণের মূলে এই একই আদর্শ—জাপান যাহা করিতে পারে, আমরাও তাহা করিতে পারি; আমাদিগকে জাপানের মত উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য রাজশক্তির অধীনতা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের একদল অদূরদর্শী সাংবাদিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্র লেখকের অনুকরণ করিয়া জাপানকে গালি দেন এবং জাপানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিস্মৃত হন যে জাপান এসিয়ার স্বাধীনতার

সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত। এসিয়ার অন্য দেশের নেতারা যদি জাপানের নেতাদের মত দূরদর্শী হইয়া, নিজেদের শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন এবং জাপানের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমগ্র এসিয়ার জাগরণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিপদে জাপানের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

[নয়]

রুষ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়ের পর, জাপানের নেতারা খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন যে পাশ্চাত্য রাজশক্তিগুলি প্রাণে প্রাণে জাপানের শক্তিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। কাজেই তাঁহারা স্থির করেন যে জাপানকে এশিয়াতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে। ঐ সময় যাহাতে ক্যানেডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাপানীরা শ্রমিক হইয়া মজুরী করিতে যাইতে না পারে তজ্জন্য নানা প্রকারের আইন প্রণয়ন করিবার বন্দোবস্ত হয়। যদিও রুষ জাপানের যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু জাপানের যুদ্ধে জয়ের পর, অনেক ইংরাজ ও আমেরিকান রাজনীতিকেরা জাপানকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। কাজেই জাপানী রাজনীতিবিশারদেরা

জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টিত হ'ন।

ঠিক এই সময় একদল আমেরিকান্ ধনী ব্যবসায়ী (বিশেষ করিয়া মিঃ হ্যারিশন ও তাহার সহযোগী উইলার্ড ষ্ট্রেট) স্থির করেন যে যদি কোন উপায়ে জাপানের দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল ক্রয় করা যায় তাহা হইলে পরে হয়ত ঐ রেলের সত্ত্বের ভিতর দিয়া আমেরিকার ব্যবসায় ও প্রতিপত্তি মাঞ্চুরিয়াতে প্রসার করিতে পারা যাইবে। এই সময় একদল চৈনিক রাজনীতিবিশারদেরা স্থির করেন যে যদি আমেরিকান্ এবং ইংরাজ ব্যবসায়ী ও ধনীদের দিয়া জাপানের রেলের বিরুদ্ধে কোন একটা রেলপথ গঠন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে হয়ত একদিন ইংরাজ ও আমেরিকা এক হইয়া চীনের স্বপক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে স্বীকৃত হইবে। শুধু তাই নয়, চৈনিক ও আমেরিকান্ সংবাদপত্রে ইঙ্গ-জাপানী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যে চীনের ও আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধ এই প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার ফলে আমেরিকার জাপানী গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেসিডেণ্ট ট্যাফ্টের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট মিঃ নক্স প্রস্তাব করেন যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল লাইনটা জাপানী গভর্ণমেণ্টের ও কোন কোম্পানীর নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া আন্তর্জাতিক (international) রেল লাইন করা হউক। জাপান এই প্রস্তাবে অসম্মত হয় এবং যাহাতে আমেরিকার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হয়

তাঁহার জন্য একদিকে রুষিয়ার সহিত একটা গুপ্ত সন্ধি করে এবং অপর দিকে ইংলণ্ড যাহাতে জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সহিত যোগ না দেয় তাহারও চেষ্টা করে। এই রুষ জাপানের গুপ্ত সন্ধির ফলে স্থির হয় যে যদি কোন রাজশক্তি জাপান বা রুষিয়ার মাঞ্চুরিয়াস্থ কোন প্রকারের অধিকারের বা সত্ত্বের উপর হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে উভয়ে একত্র হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। এই স্থানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে জাপান রুষ জাপানের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত এক সন্ধি দ্বারা স্থির করে ফ্রান্স জাপানের সত্ত্বসমূহ (যাহা জাপান অধিকার করিয়াছে) তাহা মানিবে এবং জাপান সুদূর প্রাচ্যস্থ ফ্রান্সের সত্ত্বগুলি মানিবে।

চীন ও আমেরিকা একত্র হইয়া মাঞ্চুরিয়াতে যাহাতে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি না হয় তাহার জন্য যে প্রয়াস করে, তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না কেন ?—জাপান বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে রুষিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পূর্ণ সহায়তা পায় কাজেই চীন ও আমেরিকার পরাজয় হয়। রুষিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জাপানকে সাহায্য করিতে কেন প্রস্তুত হয় ?—ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের তখনকার অবস্থা ছিল যে সুদূরপ্রাচ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়াকে (Triple Entente Powers) ভবিষ্যতে জাপানের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইবে, কাজেই এই তিন রাজশক্তি জাপানের সহিত শত্রুতা করিয়া

[দশ]

রুষ-জাপান যুদ্ধের পর ইওরোপে রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথমতঃ ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সন্ধি থাকার দরুণ, রুষিয়ার পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সও হীনবল হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের হীনবলতার ফলে তাহার বিশ্বরাজনীতির পন্থা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ফ্রান্সের পক্ষে দুইটি পথ ছিল ঃ

(ক) জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং তার ফলে ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বমূলক সন্ধি করা ; অথবা

(খ) কোন উপায়ে ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

এই দুই পন্থার মধ্যে দ্বিতীয় পন্থা—ফ্রান্স ও ইংরাজের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন কার্য্যে পরিণত হয়। তাহার প্রধান কারণ হইল যে একদিকে রুষ জাপানের যুদ্ধের পর ইংরাজের আর রুষিয়ার ও ফ্রান্সের ভয় থাকে না ; অপর-দিকে জার্ম্মানীর শক্তিবৃদ্ধির ফলে ইংরাজ ও জার্ম্মানীর মধ্যে রেষারেষি আরম্ভ হয়। এই সময়ে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে এই মত প্রবল হয় যে জার্ম্মানী এই দুই রাষ্ট্রশক্তির ভবিষ্যতে শত্রু হইতে পারে ; কাজেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব প্রয়োজন। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড এই মতের একজন প্রধান পোষক ছিলেন ; এবং তাঁহারই বিশেষ চেষ্টার ফলে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে

যে সমস্ত বিবাদের কারণ ছিল তাহা মিটমাট হইয়া যায়; মিশরে ইংরাজের আধিপত্য ফ্রান্স মানিয়া লয় এবং মরক্কোতে ফ্রান্সের ও স্পেনের বিশেষ সত্ত্ব ইংরাজ মানিয়া লয়।

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজের সন্দিগ্ধ হইবার প্রধান কারণ এই যে জার্ম্মানী নিজের নৌবাহিনী এমন ভাবে বৃদ্ধি করিতে থাকে যে উহা ইংরাজ-রাজশক্তির পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ইংরাজের ব্যবসায়ে অনেক লোকসান হয়। দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মানী নিজের রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য বার্লিন-বাগদাদ্ রেল পথ গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। তুর্কিতে জার্ম্মানীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও পারস্য উপসাগরকূলে জার্ম্মানীর বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা ইংরাজ পছন্দ করে নাই। তৃতীয়তঃ জার্ম্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইল্‌হেলম রুষ জাপানের যুদ্ধের পর যাহাতে রুষিয়া ও জার্ম্মানীর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এক সময় জার্ম্মান রাজনীতিবিশারদদের ধারণা ছিল যে এই পন্থাদ্বারা তাহারা ইংরাজকে ভীত করিতে পারিবে। সোজা কথায় ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা জার্ম্মানীর বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মপ্রণালী ইংরাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা ভাবেন যে যদি জার্ম্মানী রুষিয়া ও তুর্কি এবং তৎকালীন জার্ম্মানীর

বন্ধু অস্ট্রিয়া ও ইতালি একত্র হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং যদি ফ্রান্স তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় তাহা হইলে কেবল জাপানের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজ নিজের স্বার্থরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই ইংরাজ আত্মরক্ষার এবং জার্ম্মানীর শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব করা শ্রেয়ঃ মনে করে। সেজন্য ইংলণ্ড-রাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের চেষ্টায় ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত বা বন্ধুত্ব-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে উভয় রাজশক্তি যাহাতে রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিতে পারে এবং যাহাতে রুষিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ না হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। রুষ-জাপান যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রুষিয়া বলহীন হয় এবং তাহার শক্তি-বৃদ্ধির জন্য নানা বিষয়ে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয়; কাজেই রুষিয়াকে বৈদেশিক রাজশক্তিদের নিকট হইতে টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিতে হয়। জার্ম্মানী মুখে রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব দেখাইলেও কিন্তু রুষিয়ার শক্তিবৃদ্ধির জন্য তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল না। ফলে রুষিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নিকট হইতে কয়েক কোটি পাউণ্ড ঋণ করে; জার্ম্মানী রুষিয়াকে আর্থিক সাহায্য না করায় রুষ ও জার্ম্মানীর মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি হয়; অপরদিকে ফ্রান্স, ইংরাজ ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বৃদ্ধি পায়।

রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে রুষিয়া সুদূর প্রাচ্যে রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তখন রুষিয়ার নেতারা স্থির করে যে রুষিয়া বলকান উপদ্বীপে, পারস্য ও তুর্কির দিকে শক্তি বিস্তার করিবে। ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা করিতে সমর্থ হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইবে ইহাই রুষ-নেতাদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল; এবং সেজন্য তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টিত হয়। ইংলণ্ডের নেতারাও এই সুযোগে রুষিয়ার সহিত এক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করে; তাহাতে স্থির হয় যে রুষিয়া মঙ্গোলিয়ায় এবং উত্তর পারস্যে তাহার শক্তি বিস্তার করিলে ইংরাজ তাহাতে আপত্তি করিবে না; পক্ষান্তরে ইংলণ্ড তিব্বত সম্পূর্ণভাবে দখল করিলে এবং আফগানিস্থানে ও দক্ষিণ পারস্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিলে তাহাতে রুষিয়া আপত্তি করিবে না। এই চুক্তিনামার ফলে ইওরোপে ইংরাজ, রুষিয়া ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয় এবং এই তিনটি রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি যে একদিন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে সেই ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি কেমন করিয়া প্রাচ্যে জাপান, ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়; তাহাতে জাপানের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং প্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে আর কোন রাজশক্তি থাকে না। জাপানের সঙ্গে ইওরোপীয় রাজ-

শক্তিদের বন্ধুত্ব করার একান্ত প্রয়োজন ছিল ; কারণ ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর সহিত ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার কোন যুদ্ধে জাপান যদি জার্ম্মানীর সহিত যোগ দেয় তাহা হইলে উক্ত রাজশক্তিগণের, বিশেষতঃ রুষিয়া ও ইংলণ্ডের, সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কাজেই প্রাণে প্রাণে জাপানীদের না চাহিলেও দায়ে পড়িয়া তাহাদের জাপানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হয়। এই সুযোগে জাপান নির্ভয়ে কোরীয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। এ কথা মনে রাখিবেন যে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের স্থান নাই, কেবল জাতীয় স্বার্থরক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধি করাই প্রথম উদ্দেশ্য ও প্রধান।

যখনই ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছিল তখনই বুঝা গিয়াছিল যে কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার যুদ্ধ বাধিবে। কাজেই যাহাতে জার্ম্মানীর বন্ধুদের শক্তি হ্রাস হয় এবং তাহাদের মধ্যে শত্রুতা বাড়ে তাহার জন্য ভেদনীতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই সময় জার্ম্মানীর বন্ধুদের মধ্যে ছিল অষ্ট্রিয়া, ইতালি, তুর্কি এবং বুলগেরিয়া। প্রথমতঃ যাহাতে ইতালি জার্ম্মানীর সাহায্য না করে তাহার জন্য ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রুষিয়ার রাজনীতিকেরা চেষ্টিত হয়। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহারা অষ্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধির সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তুর্কির শক্তিনাশ হয় তাহার জন্য বল্‌কান উপদ্বীপের রাজশক্তিগুলির মধ্যে তুর্কির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। এই চক্রান্তের ফলে প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ বাধে এবং তাহার ফলে বুলগেরিয়া, সারভিয়া, গ্রীস ও রুমেনিয়ার সমবেত শক্তির নিকট তুর্কি পরাজিত হয় এবং ইহাতে তুর্কির শক্তি যথেষ্ট ক্ষয় হয়। এই যুদ্ধের ফলে বুলগেরিয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তাহার শক্তি খর্ব্বের জন্য আবার রুমেনিয়া, সারভিয়া ও গ্রীস একত্র হইয়া যুদ্ধ করে। এই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে বুলগেরিয়া দুর্ব্বল হয় কিন্তু রুমেনিয়া ও সারভিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ঠিক এই সময় ইতালি সুযোগ বুঝিয়া আফ্রিকাতে রাজ্যবিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে; জার্ম্মানী ইতালির বন্ধু হইলেও এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয় না কারণ ইতালি আফ্রিকাতে রাজ্যবিস্তার করিলে অর্থাৎ ত্রিপলি অধিকার করিলে তুর্কির শক্তি কমিবে; এবং জার্ম্মানী যদি তুর্কির বিরুদ্ধে ইতালিকে সাহায্য করে তাহা হইলে জার্ম্মান-তুর্কি মিত্রতার ব্যাঘাত হইবে। ইতালি যাহাতে তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে জার্ম্মানী যখন এজন্য তাহাকে উপদেশ দিতেছিল, ঠিক সেই সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া গুপ্তভাবে ইতালিকে এই আশ্বাস দেয় যে ইতালি যদি তুর্কির ত্রিপোলি দখল করে তাহাতে তাহারা কোন আপত্তি করিবে না। ইহার ফলে তুর্কো-ইতালিয়ান যুদ্ধ হয়। বলকান যুদ্ধ ও তুর্কো-

ইতালির যুদ্ধ জার্ম্মানীর বিশ্বরাজনীতির পরাজয় বলিয়া ধরিতে হইবে।

বলকান যুদ্ধের পর হইতে ইওরোপে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে সুদূর প্রাচ্যে জাপানের শক্তি বাড়িতে থাকে এবং কোন ইওরোপীয় রাজশক্তি যে জাপানকে আক্রমণ করিবে জাপানের সে ভয় দূর হয়। জাপান কিন্তু সেজন্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে নাই ; ঐ সময় যাহাতে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারে, বিশেষতঃ নৌবাহিনী বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে ; নিজের ব্যবসাবাণিজ্যবিস্তারের দ্বারা আর্থিক শক্তি বাড়াইতে থাকে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে বলকান যুদ্ধের সময় এবং ইতালো-তুর্কি যুদ্ধের সময় ইংরাজের সহানুভূতি তুর্কির বিরুদ্ধে ছিল। তাহার প্রধান কারণ তুর্কির সহিত জার্ম্মানীর বন্ধুত্ব। তাহা ছাড়া আর একটী কারণ ছিল—বলকান যুদ্ধের ও ইতালো-তুর্ক যুদ্ধের পূর্ব্বে নব্যতুর্কিদলের নেতৃত্বে তুর্কিতে জাতীয় বিপ্লব ঘটে। এই বৈপ্লবিকরা Pan-Islamism অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানসম্প্রদায়ের শক্তি একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিল এবং সমস্ত মুসলমান জগতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। নব্যতুর্কি শক্তিশালী হইলে হয়ত কোনদিন মিশরে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব হইতে পারে এবং ভারতবর্ষের মুসলমানেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে যাইতে

পারে, সেজন্যই তুর্কির শক্তিক্ষয়ে ইংলণ্ডের লাভ ভিন্ন লোকসান ছিল না। ইংলণ্ডের তুর্কি বিরোধী পন্থা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজবিদ্বেষের কারণ হয়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা মৌলানা মহম্মদ আলির অধুণালুপ্ত "কমরেড" (Comrade) পত্রিকা পড়িলে অনেক সংবাদ পাইবেন। রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে যেমন ভারতে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যে নূতন জাতীয়তার ভাব ফুটিয়া উঠে, ইতালি-তুর্কির যুদ্ধ এবং বলকান যুদ্ধের ফলে তেমনি বহু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজবিদ্বেষ এবং জাতীয়তার ভাব জন্মে।

[এগার]

১৯১৪ সালে জার্ম্মানী যখন রুষিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইংরাজ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে (বেলজিয়ামের স্বাধীনতা নাশের যুক্তিতে) যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন সমস্ত জগতের রাজশক্তিগুলি জাপানের দিকে চাহিয়াছিল। জার্ম্মান রাজনীতিবিশারদেরা অদূরদর্শী ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা অনেক আশা করিয়াছিল যে, হয়ত ইংরাজ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না; এবং ইংরাজ যদি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে তাহা হইলে জাপান কোন কারণেই জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না।

জার্ম্মানীর নেতারা জাপানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য কখনই চেষ্টা করে নাই ; অথচ তাহারা আশা করিয়াছিল যে জাপান জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইবে না !

জাপান যদি ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিত যোগ দেয় তাহা হইলে জার্ম্মানীর বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে ; কাজেই ১৯১৪ সালের যুদ্ধ আরম্ভের পর জার্ম্মানী চেষ্টা করে যাহাতে এই যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী না হয় এবং ইওরোপে সীমাবদ্ধ থাকে। জার্ম্মানীর এ প্রয়াস সফল হয় না ; তাহার প্রধান কারণ এই যে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিভিন্ন বৈদেশিক (এশিয়াস্থ ও আফ্রিকাস্থ) উপনিবেশগুলি দখল করিতে মনস্থ করিয়াছিল। এক সময়ে ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা জাপান কর্ত্তৃক সিংতাউ দখলের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু জাপান স্থির করে যে এই যুদ্ধে যোগ দিয়া সে নিজেই জার্ম্মানীর চীন দেশস্থ অধিকারসমূহ জার্ম্মানীর হাত হইতে কাড়িয়া লইবে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় মার্কুইস্ ওকুমা স্বয়ং আমাকে বলেন যে, যেমন ১৯০৪—০৫ যুদ্ধে জাপান রুষিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষিয়াকে তাড়াইবার বন্দোবস্ত করে, তেমনি ১৯১৪ সালেও জাপান স্থির করে যে জার্ম্মানীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া জার্ম্মানীকে সানটুং প্রদেশ হইতে দূর করিবে। কারণ জাপানের বিশ্বরাজনীতির ভিত্তি হইতেছে, "সুদূর প্রাচ্য হইতে একে একে পাশ্চাত্য রাজ-শক্তিদের তাড়ান এবং স্তরে স্তরে সমস্ত এশিয়ার উদ্ধারসাধন

করা।" জার্ম্মানীর সম্রাট উইল্‌হেলম্‌ যে জাপানবিদ্বেষী ছিলেন, জাপানীরা তাহা ভুলে নাই।

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে জাপান জার্ম্মানীকে বলে যে যদি এক মাসের মধ্যে সানটুংস্থ জার্ম্মান অধিকার জাপানের হাতে অর্পণ না করে বা চীনকে ফেরত না দেয়, তাহা হইলে জাপান জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী ও ফ্রান্স, রুষিয়ার সহিত মিলিয়া জাপানকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফেরত দিতে বাধ্য করে। জাপান দশ বৎসর পরে ১৯০৫ সনে রুষিয়াকে পরাজিত করিয়া তাহাকে লিয়াও-টুং উপদ্বীপ হইতে তাড়ায়; এবং বিশ বৎসর পরে ১৯১৫ সালে জাপান জার্ম্মানীকে সুদূর প্রাচ্য হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়।

[বার]

১৯১৪—১৯১৮ সনের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জাপানের স্থান কোথায়, এ কথাটা অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরা চিন্তা করেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই যুদ্ধে জাপান ও ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে ইংরাজ-মিত্রপক্ষ জার্ম্মান ও তাহার সহযোগিদিগের নিকট পরাজিত হইত। ১৯১৪ সনে যখন অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী সারভিয়া ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ইহা জানা ছিল যে ফ্রান্স রুষিয়ার হইয়া যুদ্ধ

কিনা সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা ছিল যে হয়ত ইংরেজ এ যুদ্ধে নামিবে না। যদিও ইতালি, জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ ছিল তথাপি অস্ট্রিয়ার হইয়া যুদ্ধ করিয়া ইতালি অস্ট্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

যখন জার্ম্মানী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার সুযোগ পায়। একদিকে অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী এবং অপর দিকে সারভিয়া, রুষিয়া ও ফ্রান্সে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখনও অনেক জার্ম্মান রাজনীতিকদের বিশ্বাস ছিল যে ইতালি জার্ম্মানীর হইয়া যুদ্ধ করিবে; কিন্তু ইতালি কোন পক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলে মনে হয় যে ইতালি জার্ম্মানি ও অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই ঃ—ট্রিপল্ এ্যালায়েন্সের (Triple Alliance) মর্ম্মানুযায়ী যখন জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়াকে অথবা এই দুই রাজশক্তির কোন একটিকে অন্য কোন রাজশক্তি আক্রমণ করে তখন ইতালি অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর হইয়া যুদ্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, একথা স্থির ছিল যে সমস্ত বিশ্বরাজনৈতিক ব্যাপারেই অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী ইতালির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যপন্থা স্থির করিবে। ইতালির নেতারা বলে যে অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী অন্য রাজশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই; এবং অস্ট্রিয়া ও

জার্ম্মানী ইতালির সহিত পরামর্শ না করিয়াই সারভিয়া, রুষিয়া, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করে; কাজেই ইতালি জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে বাধ্য নহে। তারপর ১৯১৪ সনের যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে ইতালি অনেকবার জার্ম্মানীকে জানায় যে যদি কোন সময় অস্ট্রিয়া সারভিয়াকে আক্রমণ করে এবং তাহার ফলে বল্‌কান উপদ্বীপে তাহার নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে তাহা হইলে ইতালি তাহাকে কখন সাহায্য করিবে না। ইতালি আরও জানায় যে যদি অস্ট্রিয়া নূতন রাজ্য দখল করে তাহা হইলে অস্ট্রিয়াকে ইতালির উত্তরস্থিত তিরোলের অংশ ইতালিকে দিতে হইবে; অস্ট্রিয়া যদি ইহাতে অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী যেন ইতালির সাহায্য প্রত্যাশা না করে। অস্ট্রিয়া ইতালির প্রস্তাবে রাজি হয় না কাজেই ১৯১৪ সালের যুদ্ধের প্রারম্ভে ইতালি, জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়াকে সাহায্য না করিয়া নিরপেক্ষ থাকে; তারপর যখন ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রুষিয়া ইতালিকে অস্ট্রিয়ার দক্ষিণাংশ দিতে স্বীকৃত হয় তখন ইতালি জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯১৪ সালে যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া ইতালির প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয় এবং অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার জন্য ইতালির প্রান্তদেশে কয়েক লক্ষ সৈন্য রাখিতে বাধ্য হয়। যদি ইতালি প্রথম হইতে অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে অস্ট্রিয়া

ইতালির প্রান্তদেশ হইতে কয়েক লক্ষ সৈন্য রুষিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিত এবং ফ্রান্সকে আত্মরক্ষার জন্য ইতালির প্রান্তে কয়েক লক্ষ সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইতে হইত। শুধু তাই নয়, ইতালি যদি অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রদেশ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে মার্ণে সৈন্য আনিয়া জার্ম্মানীর প্যারিস আক্রমণের পথ আটকাইতে পারিত না। কাজেই ইতালি যখন জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জার্ম্মানীর যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

ইতালির দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়া জাপানের অবস্থা বিচার করা যাউক। জাপান ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিত। প্রথমে জার্ম্মানীর চেষ্টা হয় যে ইওরোপের যুদ্ধ যাহাতে বিশ্বব্যাপী না হয়; কারণ জার্ম্মানীর ভয় ছিল যে তাহা হইলে হয়ত তাহার এসিয়াস্থ ও আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলি সে রক্ষা করিতে পারিবে না। জাপান ইচ্ছা করিলে জার্ম্মানীর উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিত; কিন্তু জাপান জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

জাপান যদি কোন পক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত না হইত অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ তাহার নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারতমহাসাগর হইতে ইওরোপে লইয়া যাইতে পারিত না; এবং ইংরাজ

নৌবাহিনী জার্ম্মান নৌবাহিনীকে তাহার নিজের বন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। জাপান যদি নিরপেক্ষ থাকিত তাহা হইলে জাপানের আকস্মিক আক্রমণের হাত হইতে সাইবিরিয়া রক্ষার জন্য রুষিয়াকে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ সৈন্য সাইবিরিয়াতে রাখিতে হইত। তাহার জন্য রুষিয়ার অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানিকে আক্রমণের জন্য হয়ত পাঁচ লক্ষ সৈন্যের অভাব হইত। ফলে রুষিয়া হয়ত পূর্ব্ব প্রুসিয়া (East Prussia) আক্রমণ করিয়া জার্ম্মানীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না; তাহা হইলে জার্ম্মানী আরও লক্ষাধিক সৈন্য পূর্ব্ব প্রুসিয়া হইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিত, এবং তাহার ফলে হয়ত ফ্রান্স মার্ণের যুদ্ধে (Battle of Marne) জার্ম্মানীর প্যারিসের দিকে অগ্রসরের পথ রুদ্ধ করিতে পারিত না।

জাপান যখন ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার পক্ষ লইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন জাপানের সম্পূর্ণ রণশক্তি ও অর্থশক্তি ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার দিকে থাকায় তাহারা (ইংরেজ, ফ্রান্স ও রুষিয়া) তাহাদের এসিয়াস্থ সৈন্য ইউরোপে লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। ইংরাজ নির্ভয়ে ভারত হইতে ভারতীয় ও ইংরাজ সৈন্য ইউরোপে, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পাঠাইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রথমতঃ ইংরাজ জানিত যে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে না এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ জানিত যে ভারতবর্ষ যদি

তাহার পক্ষে ছিল; এবং যদিই বা ভারতে কোন বিশেষ গুরুতর বিপ্লব হয় তাহা হইলে তাহারা জাপানের সাহায্য পাইবে।

জার্ম্মানীর বিপক্ষে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে জার্ম্মানীর এসিয়াস্থ উপনিবেশগুলি জাপান ও ইংরাজের হাতে থাকে। উপরন্তু জাপানের কলকারখানা দিবারাত্র অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিতে থাকে; ঐ অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত ইংরাজ, ফ্রান্স বিশেষতঃ রুষিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বিশেষ বেগ পাইত। একথা সকলেই জানেন যে এক সময় জাপান রুষিয়ার সৈন্যদের অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিবার জন্য একটা সামরিক মিশন রুষিয়াতে পাঠাইয়াছিল। রুষিয়ার রেলোয়ে সংগঠন যাহাতে না ভাঙ্গিয়া পড়ে সেজন্যও জাপান অনেক সাহায্য করে। আমাকে স্বর্গীয় মার্কুইস ওকুমা বলিয়াছিলেন যে জাপান ব্রিটিস নৌবাহিনীকেও বড় বড় কামান এবং গোলা দিয়া সাহায্য করে।

জাপান যদি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিত, অথবা জাপান যদি রুষ বিপ্লবের পর (যখন জার্ম্মানী ও রুষিয়াতে সন্ধি স্থাপিত হয়) জার্ম্মানীর সহিত একলা শান্তি সন্ধি করিত তাহা হইলে আমেরিকা কখনো জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহস পাইত না; কারণ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জকে জাপানের আক্রমণের আশঙ্কা হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য আমেরিকাকে তাহার নৌবাহিনী প্রশান্ত

মহাসাগরে বাধ্য হইয়া রাখিতে হইত। তাহা হইলেই আতলান্তিক অতিক্রম করিয়া তাহাকে আর ইংরাজ-প্রতিপক্ষকে সাহায্য দান করা সম্ভবপর হইত না।

যখন জার্ম্মানী ও রুষিয়া বলশেভিক বিপ্লবের পর শান্তি সন্ধি করে, তখন বা তাহার পূর্ব্বে জাপান যদি জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত তাহা হইলে জাপান অনায়াসে ইংরাজকে হংকং ও সিঙ্গাপুর হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিত এবং ফ্রান্সকে ইন্দোচীন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিত। এই আশঙ্কা ছিল বলিয়াই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া ও ইতালি জাপানের সহিত এক গুপ্ত সন্ধি দ্বারা স্থির করে যে জাপান জার্ম্মানীর চীনস্থ অধিকার এবং প্রশান্ত ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটী অধিকার করিবে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে "ইসি-ল্যানসিঙ্গ সন্ধি" (Ishii-Lansing Agreement) স্বাক্ষর করে এবং জাপানের যে মাঞ্চুরিয়াতে বিশেষ সত্ত্ব আছে তাহা আমেরিকা স্বীকার করে।

এখন কথা উঠিতে পারে যে জাপান জার্ম্মানীর পক্ষে যায় নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে জাপানের নেতারা অদূরদর্শী ছিলেন না। জাপান যদি তাহার সন্ধিগুলি ভাঙ্গিয়া জার্ম্মানীর হইয়া যুদ্ধ করিত তাহা হইলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, রুষিয়া ও আমেরিকা চিরকালের জন্য

জাপানের বিরুদ্ধে যাইত; শুধু তাই নয়—জার্ম্মানী যে জাপানের সহিত প্রকৃত মিত্রতা করিবে সে সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ ছিল। কারণ জার্ম্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইল্‌হেল্‌ম্‌ সর্ব্বদা জাপানের বিরুদ্ধে পীতাতঙ্ক (Yellow Peril) মন্ত্র প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তারপর জাপান যদি প্রশান্ত মহাসাগরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার অধিকার দখল করিতে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে সমস্ত পাশ্চাত্য রাজশক্তি জাপানের বিরুদ্ধে যাইত। জাপান জানিত যে চীন জাপানের সাহায্যের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিদের বিরুদ্ধে কোনদিনই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না; বরং চীন সুবিধা পাইলে ইংলণ্ড, রুষিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তির সহিত মিলিয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত। ভারতবর্ষও যে জাপানকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিত না, তাহাও জাপানের অজ্ঞাত ছিল না। জাপান যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া ও ইতালির সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া জার্ম্মানীর সাহায্যে যাইত তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের মহাবলশালী শত্রুদল বাড়িত। জাপানের দূরদর্শী নেতারা কাজেই ১৯১৪—১৯ যুদ্ধের সময় কেবল জার্ম্মানীকেই প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের তীর হইতে তাড়াইয়া ক্ষান্ত ছিলেন। এসমস্ত সত্ত্বেও ইহা ঠিক যে জাপান যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার হইয়া না যুদ্ধ করিত তাহা হইলে ঐ যুদ্ধে জার্ম্মানীর জয়ের অধিক সম্ভাবনা ছিল।

*   *   *   *

ভারতবর্ষের সাহায্য ব্যতীতও যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া জার্ম্মানীকে পরাজিত করিতে পারিত না তাহা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষ হইতে দশ লক্ষের অধিক সৈন্য ইংলণ্ডের জন্য ইওরোপে—ফ্রান্স ও গ্যালিপলিতে, আফ্রিকাতে—ইজিপ্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে, এসিয়াতে—পারস্য, তুর্কি এবং চীনে যুদ্ধ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যসামগ্রী (বিশেষতঃ গম ইত্যাদি) ইংলণ্ডের সৈন্যদের অনেক সাহায্য করে। ভারতবর্ষের তুলা দিয়া কত Gun cotton তৈয়ার হয়, ভারতবর্ষের মালমসলা দিয়া কত অস্ত্রশস্ত্র ভারতে ও ইংলণ্ডে তৈয়ার হয় তাহার ইয়ত্তা নাই, এবং নিজে না খাইয়া ভারতবর্ষ সাতশত কোটি টাকা দিয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনে সাহায্য করে। ইহা পূর্ণ সত্য যে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়র্লণ্ডের যত সৈন্য ইংলণ্ডের হইয়া যুদ্ধ করে, একা ভারতবর্ষ তার চেয়ে অধিক সৈন্য দেয় এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া সাহায্য করে। ভারতবর্ষের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজ কখনও তুর্কিকে পরাজিত করিতে পারিত না। ১৯১৫-১৬ সালে জার্ম্মানীর সামরিক নেতারা বুঝিতে পারে যে যদি ভারতে বিপ্লব হয় তাহা হইলে ইংরাজকে বাধ্য হইয়া অনেক সৈন্য ভারতে পাঠাইতে হইবে এবং তাহা হইলে ইংরাজ ভারতীয় সৈন্য ইজিপ্ট, তুর্কি, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে ব্যবহার করিতে

পারিত না। এই কথা বুঝার পর জার্ম্মানরা এবং তুর্কির নেতারা (বিশেষতঃ এন্‌ভার পাসা ও জামাল পাসা) যাহাতে ভারতে বিপ্লব হয় তাহার জন্য ভারতীয় বৈপ্লবিকদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। তুর্কির ও জার্ম্মানীর এই উদ্দেশ্য যে সফল হয় নাই তাহার প্রধান কারণ মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভারতের নেতারা ইংলণ্ডের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও বৈপ্লবিক মনোভাব ছিল না। শুধু তাই নয়; একথা সত্য যে ১৯১৪-১৫ সালের পূর্ব্বে তুর্কি ও জার্ম্মানী ভারতের বৈপ্লবিকদের সাহায্য করার কথা একেবারেই চিন্তা করে নাই; কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের ন্যায় দূর দেশে বিপ্লব করার জন্য সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বিপ্লব 'দীল্লিকা লাড্ডু' নয় এবং 'বিপ্লব করিব' বলিলেই বিপ্লব হয় না। কোন দেশে কখন হঠাৎ বিপ্লব হয় নাই এবং যখনই হঠাৎ বিপ্লবের জন্য চেষ্টা যে কোন দেশে হইয়াছে, উহা অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

এই সঙ্গে বলা দরকার যে বিদেশে বিপ্লব আনা সম্বন্ধে ইংরাজ রাজশক্তি জার্ম্মান ও তুর্কির চেয়ে বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ইংরাজ রাজনীতিকেরা ১৯১৪ সালের যুদ্ধারম্ভের অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে চিন্তা করিয়াছিল যে কোন দিন তুর্কির শক্তিনাশের জন্য "আরব বিপ্লব" খুব প্রয়োজনীয় হইবে; তাই ১৯১৫ সালে তুর্কি যখন ইংরাজ,

ফ্রান্স ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তৎক্ষণাৎ ইংরাজ আরব বিপ্লবীদের অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করে। আরবী বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য ইংরাজ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। 'Lawrence in Arabia" ইত্যাদি পুস্তকে ইহার কিছু কিছু বিবরণ ও সংবাদ পাওয়া যায়। আরব বৈপ্লবিকেরা ইংরাজের টাকা, অস্ত্র শস্ত্র ও নানা প্রকারের সাহায্য লইয়া তুর্কির হাত হইতে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

[তের]

১৯১৫ সালে যখন বিশ্ব-সমর খুব জমিয়া উঠে, জাপান তখন জার্ম্মানীকে সান্‌ট্ং হইতে তাড়াইয়া চীনে আপনার শক্তি বাড়াইতে চেষ্টিত হয়। জাপান যখন সান্‌ট্ং অধিকার করে তখন ইংরাজ সৈন্য জাপানের সহিত যোগ দেয় কিন্তু যখন সিংটাও দুর্গ জার্ম্মানদের নিকট হইতে জাপান অধিকার করে তখন, জাপান ইংরাজকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয় নাই। ইহার প্রধান কারণ যে জাপানের ভয় ছিল যে যদি ইংরাজ সিংটাওতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে তাহা হইলে হয়ত ওখান হইতে নড়িতে চাহিবে না। ইংরাজ যদি সিংটাও দখল করিত এবং উহা নিজের হাতে রাখিত তাহা হইলে ইংরাজের নৌ-শক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে খুব বাড়িয়া যাইত। জাপানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে

১৯১৪-১৮ যুদ্ধের শেষে যেন কোন পাশ্চাত্য রাজশক্তি চীনের কোন সহরে বা দ্বীপে নূতন করিয়া শক্তি বিস্তার করিতে না পারে ; জাপানের আশঙ্কা ছিল যে হয়ত চীন পররাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে একত্র হইয়া কাজ করিবে না। সে জন্য জাপান চীনের নিকট দাবী করে যে, জাপান মাঞ্চুরিয়াতে নিজের শক্তি বিস্তার করিবে ; এবং চীন যদি কখন কোন বৈদেশিক রাজশক্তির নিকট হইতে অভিজ্ঞ (Expert) সাহায্য লইতে চায় বা অর্থ সাহায্য লইতে চায় তাহা হইলে প্রথমে জাপানের নিকট তাহা চাহিতে হইবে এবং জাপান যদি উহা পূরণ করিতে না পারে তবেই অন্য রাজশক্তির নিকট যাইতে পারিবে। জাপানের এই সব প্রস্তাবগুলিকেই সংক্ষেপতঃ জাপানের একুশ দাবী (Twenty-one Demands) বলে।

জাপানের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, পাশ্চাত্য রাজ-শক্তিরা বিশেষতঃ ইংরাজ ও আমেরিকা এই প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জাপান চীনের নিকট যে একুশটি দাবী করে, ঐ প্রস্তাবগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল ; এবং উহার পঞ্চম ভাগের প্রস্তাবগুলি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বলিয়া মনে হয়, কারণ উহার দ্বারা জাপান চৈনিক পুলিশ ও সেনাবিভাগে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিতে পারিত। জাপানকে ঐ প্রস্তাব-গুলি শেষে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সে অন্য প্রস্তাবগুলি চীনকে মানিতে বাধ্য করে। চীন যদি জাপানের প্রস্তাবগুলি

মানিতে না রাজি হইত তাহা হইলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, এই ভয় দেখায়। এই প্রস্তাবগুলির জোরে জাপান তাহার মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ইত্যাদির মৌরসী সত্ব ৯৯ বৎসরের জন্য বাড়ায় এবং চীনকে বাধ্য করে যে মাঞ্চুরিয়ার জন্য চীন যদি টাকা ধার করে তাহা জাপানের নিকট হইতে ধার করিতে হইবে। চীন যে প্রস্তাবগুলি মানিয়া লয় তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রস্তাব ছিল এই যে চীন তাহার কোন রাজ্যের অংশ, দ্বীপ বা বন্দর অন্য কোন রাজশক্তিকে বিক্রয়, দান বা মৌরসি পাট্টা (lease) দিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া অন্য সমস্ত প্রস্তাবে নূতন ধরণের কিছু ছিল না, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া ঐ প্রকার সত্ব (right) চীনে ভোগ করিতেছিল। জাপানের এই পন্থা অবলম্বনের একটা প্রধান কারণ ছিল যে চীনের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট ইয়ুয়ান্ সি কাই (Yuan Shi Kai) প্রবল জাপান-বিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি ইংরাজের সাহায্যে চীনে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি ইংরাজের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করিয়া ভবিষ্যতে জাপানের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন, জাপান এই আশঙ্কার হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য প্রথম হইতেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে এবং পরে ইয়ুয়ান্ সি কাইর পতনের পথ পরিষ্কার করে।

এই স্থানে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে জাপান ১৯০৫ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে সফলকাম হয় না। জাপানের নেতারা এক সময়ে মনে করিয়াছিলেন যে যদি ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেন চীনে বিপ্লব আনিতে পারেন, তাহা হইলে হয়ত ডাঃ সানের চেষ্টায় চীন ও জাপানের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন হইতে পারে। জাপানের দেশভক্ত নেতারা যথা শ্রদ্ধেয় তোয়ামা সান্ ও ও অন্যান্য দূরদর্শী নেতারা যথা ৺ইনুকাই সান্ (জাপানের প্রধান মন্ত্রী, যাঁহাকে ১৯৩২ সনে একজন জাপানী নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ হত্যা করে) ডাঃ সান্‌কে অর্থ দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। জাপানের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল যে জাপান চীনের সহিত আপোষে মাঞ্চুরিয়াতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে; এবং জাপান ও চীন উভয়ে একত্র হইয়া যথা সময়ে অন্যান্য ইওরোপীয় রাজশক্তির কবল হইতে সমগ্র এসিয়ার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে। ডাঃ সান্ ও জাপানের নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে জাপান যদি ১৯০৪—৫ সালে রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিত তাহা হইলে মাঞ্চুরিয়া রুষিয়ার হাতে চলিয়া যাইত। কাজেই জাপান যদি মাঞ্চুরিয়াতে আত্মশক্তি বিস্তার করিয়া রুষিয়া ও চীনের মধ্যে একটা নূতন রক্ষা-রাজ্য (Buffer state) স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে চীন পুনরায়

রুষিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারিবে না এবং চীন ও রুষিয়া মিলিয়া জাপানকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবে না। অপর দিকে চীন যদি জাপানের পূর্ণ সাহায্য পায় তাহা হইলে অনায়াসে চীন দেশ হইতে বৈদেশিক রাজশক্তির বিশেষ অধিকার (Extraterritorial jurisdiction) শেষ করিতে পারিবে ; এবং জাপান ও চীনের সম্মিলিত চেষ্টায় চীনের দক্ষিণস্থ ও পূর্ব্বদিকস্থ হৃত রাজ্যগুলি পুনরায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। *

চীন বিপ্লবের পর ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেন চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হয়েন ; পরে অন্তর্বিগ্রহ হইতে চীনকে রক্ষা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টের পদ ছাড়িয়া দেন এবং ইয়ুয়ান্ সি কাই চীনের প্রেসিডেণ্ট হয়। ইয়ুয়ান্ সি কাইর আদর্শ ডাঃ সানের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধপন্থী ছিল। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পরিবর্ত্তে সে যাহাতে ইংরাজ ও আমেরিকার সাহায্যে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে তাড়াইতে পারে তাহার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে ; প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়ুয়ান্ পাশ্চাত্য রাজশক্তিগুলির নিকটে নিজেকে বিক্রীত করিয়াছিল ; নিজে সম্রাট হইবার লোভে সমগ্র চীনকে সে ইংরাজ ও আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয় ; কিন্তু সে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না। জাপান ইয়ুয়ানের শত্রুতা

* এই কথাগুলি আমার নিজের মত নয়। আমি ইহা স্বয়ং ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নিকট শুনিয়াছিলাম।

ভুলিয়া যায় নাই এবং যথাসময়ে ১৯১৫ সালে সুযোগ মত চীনের উপর নিজের শক্তি বিস্তারের জন্য একুশ দফা দাবী উপস্থিত করে এবং নিজের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করে।

১৯১৫ সালের পর জাপানের ব্যবসাবাণিজ্য চীনে খুব বাড়িতে থাকে; এবং তাহার ফলে তথায় ইংরাজের বাণিজ্য কমিতে থাকে। কাজেই ইংরাজ ব্যবসায়ীরা মনে মনে জাপানের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়। তাহারা তখন ভাবে যে যদি কোন উপায়ে চীনকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাইতে পারা যায় তাহা হইলে যুদ্ধ শেষের পর নূতন সন্ধিতে জাপান যাহাতে চীনে (বিশেষতঃ জার্ম্মানীর অধিকৃত সিংটাও বন্দর ও সানটুং প্রদেশে) নিজ আধিপত্য বিস্তার না করিতে পারে তাহার জন্য চীন জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে। ১৯১৫ পর হইতে ইংরাজ ও আমেরিকার ধনিক ও অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা জাপানের "একুশ দাবী"র বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করে। ১৯১৫-১৭ সালে আমি চীনে ও জাপানে ছিলাম এবং ঐ সময় ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাই। ঐ সময় অনেক ইংরাজ ও আমেরিকান লেখকেরা চীনে প্রচার করিতেছিল যে "জাপান এসিয়ার ও চীনের প্রধান শত্রু।" ডাঃ সান ইয়াৎ সেন, ডাঃ টং সাও ইং ও অধিকাংশ দক্ষিণ চৈনিক নেতারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ ঘোষণা করার বিরুদ্ধে ছিলেন; কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবার ছুতা করিয়া ইয়ুয়ান্ সি কাই নিজের ব্যক্তিগত শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। *

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের শেষভাগে, ১৯১৭ সালে আমেরিকার যুদ্ধে প্রবেশের পূর্ব্বে যখন ফ্রান্সের অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে তখন যাহাতে জাপান তাহার সৈন্য ফ্রান্সে পাঠায় তাহার জন্য আন্দোলন হয়। জাপানের নেতারা আমাদের নেতাদের মত বিবেচনাহীন ছিল না—কাজেই তাহারা ফ্রান্সকে জিজ্ঞাসা করে যে জাপানের সাহায্যের পরিবর্ত্তে ফ্রান্স কি দিতে প্রস্তুত। আমি যত দূর জানি ফ্রান্সে জাপানকে ইণ্ডোচীনের একাংশ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন (এ সমস্ত গুপ্ত রাজনীতির কথা); কিন্তু ইংরাজ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কারণ জাপানের শক্তি ভারতবর্ষের নিকটে বাড়িলে তাহা ইংরাজের ভয়ের কারণ হইতে পারে। সেকারণেই জাপান ইওরোপে সৈন্য পাঠায় নাই; কিন্তু জার্ম্মানীর সাবমেরিনের বিরুদ্ধে তাহারা ডেষ্ট্রয়ার ও অন্যান্য নৌযান ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত পাঠায়।

১৯১৪-১৮ যুদ্ধের মধ্যে জাপান প্রাচ্যে জার্ম্মানীর ব্যবসায় ক্ষেত্র অধিকার করিয়া খুব ধনী হইয়া উঠে,

---

* এই সময় আমি সাংহাই হইতে "Is Japan A Menace to Asia ?" পুস্তক লিখি। এই পুস্তকের মুখবন্ধ ডাঃ টং সাও ইং লেখেন এবং ডাঃ সান্ এই পুস্তকের আদর্শ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন।

নিজের সামরিক শক্তি ও নৌবাহিনী বাড়ায় এবং চীনে যাহাতে পাশ্চাত্য রাজশক্তির প্রভাব কমে তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। তাহার ফলে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডের একদল প্রতিপত্তিশালী লোক এই মন্ত্র প্রচার করিতে থাকে যে জার্ম্মানীর পতনের পর ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে জাপানের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের নেতারা জাপানের বিরুদ্ধে অধিক কিছু না বলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরে বিরাট এক নৌবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত করেন। ইহা হইতেই ইংরাজ-জাপানের মনোমালিন্যের সূত্রপাত।

[চৌদ্দ]

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, একথা অনেকে বিশ্বাস করেন। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপটা কি এসম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। প্রথম এই কথা মনে রাখা দরকার যে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলে ছিল ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজশক্তির অত্যাচার। ইংলণ্ড যে আমেরিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা ও আর্থিক উন্নতির বিরুদ্ধে ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে আমেরিকার ১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাইর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পড়িলে বোঝা যায়।* এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে আমেরিকার বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাশালী নেতাদের, যথা জর্জ্জ ওয়াসিংটন, টমাস্ জেফারসন, হ্যামিল্টন, য়্যাডামস্ ইত্যাদির পূর্ব্বপুরুষেরা ইংলণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। এই সমস্ত নেতারা বর্দ্ধিষ্ণু ও মধ্যবিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাহাদের ধন ও প্রাণ দিয়া দেশের সেবায় নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় কথা :—আমেরিকানরা প্রথমে ইংলণ্ডের রাজশক্তি ও রাজপ্রতিনিধিদের নিকট পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

---

* Great Charters of Human Liberty (Saraswaty Library As. 4) পুস্তকে এই ঘোষণাপত্র পাওয়া যাইবে।

করে নাই; অর্থাৎ আমেরিকার বিপ্লবের নেতারা প্রথমে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিল না, তাহারা জাতীয় স্বায়ত্ত্বশাসন পাইলেই সন্তুষ্ট হইত; কিন্তু যখন ইংলণ্ডের রাজশক্তি আমেরিকানদের স্বায়ত্ত্ব শাসন দিতে অস্বীকার করে তখনই তাহারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়

তৃতীয় কথা ঃ—আমেরিকানরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিয়াছিল যে ক্ষুদ্র আমেরিকান্ শক্তি ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একলা জয়লাভ করিতে পারিবে না; কাজেই তাহারা ব্রিটিশ রাজশক্তির শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা সন্ধি করিয়া এবং তাহাদের সাহায্য লইয়া স্বাধীনতা লাভ করে। আমেরিকার বিপ্লবের প্রথমে অধিকাংশ আমেরিকানই বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল সে জন্যই জাতীয়দল অনেক যুদ্ধে প্রথম প্রথম পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে তাহাদের নেতারা কিন্তু ভীত হয় না বরং যাহাতে বৈদেশিক সাহায্য লইয়া দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে তাহার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের অসাধারণ চেষ্টার ফলে ফরাসী রাজশক্তি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায় হয়। এবং সে জন্যই অ্যামেরিকা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়।

চতুর্থ কথা ঃ—আমেরিকানরা স্বাধীনতা যুদ্ধে যদিও ফ্রান্স, স্পেন, হলাণ্ড ও অন্যান্য রাজশক্তির সাহায্যে নিজেদের

স্বাধীনতা লাভ করে তথাপি আমেরিকার নেতারা সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য আমেরিকার জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের কল্যাণ সাধন করা। কাজেই পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও বাণিজ্য ও আর্থিক নীতিতে তাঁহারা আমেরিকার পূর্ণ স্বাধীনতাপন্থা অবলম্বন করেন। এই কথা খুব ভাল করিয়া মনে রাখা দরকার যে যখন কোন রাজশক্তি, কোন আমেরিকান প্রজার বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা বা তাহার সম্পত্তি-সত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখনই আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ১৮৮২ সালে ইংরাজ আমেরিকান প্রজার (naturalized citizen) স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং আমেরিকান বাণিজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়; কাজেই আমেরিকা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ইংরাজকে ঐ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জাতীয় সত্ত্বা রক্ষা করে। একথা বলা বাহুল্য যে এই যুদ্ধে জয়ের ফলে আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়।

১৭৭৬ সালের আমেরিকার বিপ্লবের ফল কেবল যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকাস্থ স্পেনের উপনিবেশগুলিতে প্রসারিত হয়, এবং তাহার ফলে ঐ সমস্ত দেশ স্পেনের হাত হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৮১২ সালে ইংরাজ-আমেরিকান যুদ্ধের পর এবং ইওরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের শেষে ও

"ভিয়ানার কংগ্রেসের" পর ইউরোপের রাজতন্ত্রী রাজশক্তিগুলি একত্র হইয়া এই স্থির করে যে তাহারা জগতে প্রজাতন্ত্রবাদ (Democracy) প্রসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। এই রাজশক্তিগুলি—রুষিয়া, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স স্থির করে যে স্পেন যাহাতে তাহার দক্ষিণ আমেরিকাস্থ বিদ্রোহী উপনিবেশগুলিকে পুনরায় নিজের অধীনে আনিতে পারে তাহার জন্য তাহাকে সাহায্য করিবে। কাজেই উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাস্থ প্রজাতন্ত্রী রাজশক্তিগুলির মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ প্রজাতন্ত্রগুলি যদি অন্য রাজশক্তির সাহায্য না পাইত তাহা হইলে তাহারা খুব সম্ভবতঃ স্পেন ও তাহার সহযোগীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা হারাইত; এবং তাহা আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সেজন্য তাহার রাজনীতিবিশারদেরা, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট মনরো, তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব য়্যাডাম্‌স, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট জেফারসন ও ম্যাডিসন এই স্থির করেন যে যদি কোন ইউরোপীয় রাজশক্তি উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রয়াস করে বা কোন আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে যুক্ত রাষ্ট্র তাহা শত্রুতামূলক আচরণ বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। ইহাই "মনরো নীতি" (Monroe Doctrine)। "মনরো নীতি" আজ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের বিশ্বরাজনীতি-

পন্থার একটা মূল আদর্শ ; যদি কোন ইওরোপীয় বা এসিয়া রাজশক্তি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে বা এসিয়ার রাজশক্তি আমেরিকার বিশ্বরাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে সেই রাজশক্তির সহিত আমেরিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা।

আমেরিকা যখন "মনরো নীতি" ঘোষণা করে তখন প্রথমতঃ ইওরোপীয় রাজশক্তিগুলি আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং তাহারা অন্তরে অন্তরে আমেরিকার বিরুদ্ধপন্থী হয় ; কেবল ইংলণ্ড আমেরিকার পক্ষে ছিল। অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব লর্ড ক্যানিং স্বাধীনতার আদর্শবাদীরূপে আমেরিকার মত সমর্থন করেন, কিন্তু প্রকৃত কথা ছিল এই যে ইংরাজ ইওরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফ্রান্স, স্পেন ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে ছিল। এই রাজ-শক্তিগুলি যদি কোন উপায়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা হইলে তাহা ইংরাজের ক্ষতিকর হইবে। ইংরাজের ভয় ছিল যে যদি স্পেন বা ইওরোপের কোন রাজশক্তি দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ নিজের অধীনে আনিতে পারে, তাহা হইলে ঐ দেশে ইংরাজের ব্যবসায়ের সুযোগ কমিয়া যাইবে। আমেরিকার ঘোষণার বিরুদ্ধে ইওরোপের কোন রাজশক্তি দাঁড়াইতে সাহস করে নাই—কারণ তাহারা জানিত যে যদি ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলি ও মেক্সিকো একত্র হয় তাহা হইলে তাহাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড় সহজ হইবে না। সোজা কথায়, বিশ্ব-রাজনীতির খেলার ফলে ইওরোপীয় রাজশক্তিগণ স্পেনের বিদ্রোহী আমেরিকাস্থ উপনিবেশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই; এবং ইওরোপের রাজশক্তিগুলির আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ে আধিপত্য বিস্তারের পথ বন্ধ করায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়।

১৮১২ সাল হইতে আমেরিকার (Civil War) গৃহ-যুদ্ধের (১৮৬০-৬৪) পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ও পশ্চিমে (প্রশান্ত মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত) রাজ্যবিস্তার করে। এই রাজ্য বিস্তারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধ করে এবং ঐ যুদ্ধগুলির ফলে টেক্সাস (Texas) ও কালিফর্ণিয়া (California) অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্রের এই রাজ্য বিস্তার ও শক্তি বিস্তার ইংলণ্ড সন্তোষের চক্ষে দেখে নাই; কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে ইংরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি কমিতে থাকে; কিন্তু ইংলণ্ড ইওরোপের ও এসিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে (বিশেষতঃ ভারতে ও চীনে) প্রতিপত্তি ও অধিকার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য বিস্তারে বাধা দিতে পারে নাই। কিন্তু ১৮৬০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশস্থ রাষ্ট্রসমূহের (State) মধ্যে গৃহবিবাদ (Civil War) আরম্ভ হওয়া, ইংলণ্ডের বিশ্বরাজনীতিবিদ নেতারা—গ্লাডস্টোন, পামার-

ষ্টোন্, লর্ড রাসেল প্রভৃতি ক্রীতদাসপ্রথা সমর্থক ষ্টেটদের (যুক্ত রাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রদেশস্থ ষ্টেটদের) সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ফ্রান্সও ইংলণ্ডের সহিত একমত ছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে যদি অন্তর্বিগ্রহের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিপত্তি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বৃদ্ধি পাইবে। ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রদেশস্থ ষ্টেটগুলি একত্র হইয়া যদি একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে এবং উহা ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড কোন উপায়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ ষ্টেটগুলি (বিশেষতঃ কালিফর্ণিয়া, ওরিগন ও ওয়াশিংটন ষ্টেট) নিজে অধিকার করিবে। ফ্রান্স এই সময়ে মেক্সিকোতে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল; তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে যদি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রদেশস্থ ষ্টেটগুলি পরাজিত হয় তাহা হইলে হয়ত "টেক্সাস ষ্টেট" (State of Texas) পুনরায় মেক্সিকোর অধীনে আসিবে এবং তাহা হইলে ফ্রান্স মেক্সিকোর মধ্য দিয়া উত্তর আমেরিকায় নিজের প্রতিপত্তি স্থাপনের পুনরায় সুযোগ পাইবে।

ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের রাজনীতিকগণের এই চক্রান্ত কার্য্যে পরিণত না হইবার প্রধান কারণ এই যে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের উত্তর প্রদেশস্থ রাজশক্তির প্রবল নৌবাহিনী দক্ষিণ

প্রদেশকে ভাল করিয়া অবরুদ্ধ (blockade) করে এবং স্থল-যুদ্ধে পরাজিত করে। শুধু তাই নয় ইওরোপের বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে রুষিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যায় এবং জার্ম্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে থাকায় ফ্রান্স ও ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্বিদ্রোহে হস্তক্ষেপ করিতে পশ্চাৎপদ হয়। রুষিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ও আমেরিকার স্বপক্ষে দাঁড়ায় এবং রুষিয়ার রণতরী নিউ ইয়র্কে পাঠায়; তাহার স্থলসৈন্য আফগানি-স্থান অভিমুখে যায়। ঐ সময়ে প্রুসিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হেতু ফ্রান্স বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্য ইউরোপে আনিতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্র ফরাসীদের বিরুদ্ধাচরণের প্রতিশোধ নিতে মেক্সিকোর বিপ্লবীদের ফরাসী অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইতে সাহায্য করে; এবং এইরূপেই ফরাসী মেক্সিকোতে তাহার প্রতিপত্তি হারায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্বিদ্রোহের সময় ইংরাজ রাজশক্তি ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক দক্ষিণ প্রদেশের ষ্টেট সমূহকে সাহায্য করার ফলে তথায় ইংরাজ বিদ্বেষ খুব বাড়িয়া উঠে। আমেরিকার একদল লোক, বিশেষতঃ আইরিশ-আমেরিকানরা ক্যানেডা আক্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ঠিক এই সময়ে ক্যানেডাতে এক রাজনীতিক দল ক্যানেডার স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য দাবী করিতে থাকে। এই দলের নেতারা বেশ বুঝিতে পারে

যে কেবল ভিক্ষা মাগিয়া তদানীন্তন ইংরেজ রাজশক্তির নিকট হইতে কোনো প্রকার সুবিধা (concession) পাইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এই দলের নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের ইংরাজ বিদ্বেষী দলের সহিত (বিশেষতঃ আইরিস্ দলের সহিত) যোগ দেয় এবং ক্যানেডাতে বিপ্লবের জন্য খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করে। এই সময় একদল লোক আমেরিকা হইতে (যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাদের বিনা অনুমতিতে) ক্যানেডা আক্রমণ (raid) করে। তখন ইওরোপ ও এশিয়াতে ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে রুষিয়ার প্রবল বিদ্বেষ ছিল ; এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকায়, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পন্থাও পরস্পরের বিরুদ্ধে ছিল। যদিও জার্ম্মানী (প্রুসিয়া) এই সময় ফ্রান্সের ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিল এবং ইংরাজের বন্ধুত্বের প্রয়াসী ছিল কিন্তু প্রুসিয়া সর্ব্বপ্রথমে রুষিয়ার পক্ষে থাকায়, প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের শত্রুর সহকারী ছিল। শুধু তাই নয়, ইংলণ্ড ভারতবর্ষে তাহার রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদেশে যাহাতে যুদ্ধে ব্যস্ত না হইতে হয় তাহার জন্য যত্নবান ছিল। কাজেই ইংলণ্ড জানিত যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ক্যানেডার বৈপ্লবিকদের সঙ্গে মিলিয়া ক্যানেডা আক্রমণ করে, তাহা হইলে ক্যানেডা হারাইতে হইবে ; কাজেই ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদেরা স্থির করেন যে যদি ক্যানেডার প্রজাশক্তিকে পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার দান করা যায় তাহা হইলে ক্যানেডিয়ান নেতারা সম্পূর্ণ বিপ্লবের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইবে। কাজেই ইংরাজ বিশ্বরাজনীতির চক্রান্তে পড়িয়া, পাছে ক্যানেডা হারায়, সেই ভয় হইতে মুক্তি পাবার জন্য, এবং ক্যানেডার প্রজাশক্তির সাহায্যে ইংরাজের রাজশক্তি রক্ষার জন্য, ক্যানেডাকে স্বায়ত্ব শাসন দেয়। ক্যানেডা কেবল নিজের চেষ্টায় স্বায়ত্ব শাসন ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই; বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে তখন ইংরাজের অবস্থা অসুবিধা-জনক ছিল তাই ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা ক্যানেডা হারান অপেক্ষা ক্যানেডার প্রজাশক্তিকে স্বায়ত্ব-শাসনের ভার দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করেন। সেজন্যই ক্যানাডা স্বায়ত্ব-শাসন পাইয়াছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্বিগ্রহের শেষে আমেরিকার রাজশক্তি আর্থিক ও শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে শক্তি বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এই সময় হইতে ইংলণ্ড বুঝিতে পারে যে অল্প সময়ের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক মহাশক্তিশালী রাজশক্তি হইবে; এবং ইংরাজ যদি এই শক্তিশালী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে এবং তাহার ফলে উহার শত্রুতা অর্জ্জন করে তাহা হইলে উহার পরিণামে বিশ্বরাজ-নীতিক্ষেত্রে ইংরাজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল।

*   *   *   *

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজের অবস্থা খুব ভাল ছিল না, কারণ রুষিয়া ও ফ্রান্স ইংরাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৯৮ সালে

যখন স্পেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ইওরোপের প্রবল রাজশক্তিগুলি বিশেষতঃ জার্ম্মানী, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স, স্পেনের পক্ষে যায়। কেবল ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে ইংরাজ-আমেরিকান্ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধে আমেরিকার জয় হয় এবং তাহাতে আমেরিকা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে এবং কিউবাতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এসিয়ার একটি রাজশক্তি হইয়া পড়ে এবং বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশ্বরাজশক্তিপুঞ্জের প্রথমশ্রেণীর স্থান অধিকার করে।

১৭৭৬ সালের আমেরিকায় বিপ্লবের সময় হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বণিকেরা এসিয়াতে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টিত হয় এবং এই বাণিজ্য বিস্তারের ফলে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের সহিত চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এসিয়াতে রাজ্য বিস্তার করা যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল না। এসিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ চীনে যাহাতে আমেরিকার বাণিজ্য অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতিদের বাণিজ্যের সঙ্গে সমান অধিকার থাকে তাহাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়া তাহাদের আধিপত্য চীনের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন দখলের পর হইতে এই পন্থা অবলম্বন করে যাহাতে চীনের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় এবং চীনের সকল প্রদেশে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে সকল রাজশক্তির সমান অধিকার থাকিবে। এই পন্থাকে Open Door Policy বলে। আমেরিকার এই পন্থা ইংরাজ ও জাপানের মনঃপূত হয় এবং তাহার ফলে ইংরাজ ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে রুষ-জাপানের যুদ্ধের সময় আমেরিকা ইংরাজের বন্ধু জাপানকে নানাভাবে সাহায্য করে।

যেমন স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি ইওরোপীয় রাজশক্তিগণ আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে; ঠিক সেইভাবে ইংরাজ-বুয়র যুদ্ধের সময়, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও রুষিয়া ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এই সময় হইতে ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা স্থির করেন যে বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য অন্য কোন রাজশক্তির সহিত বন্ধুত্ব করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের নেতারা ইহা বুঝিতে পারেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি সম্ভাবনা কম। ইংলণ্ডে চেম্বারলেন্, ব্যালফোর, স্যালিস্বারী ল্যান্সডাউন প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদেরা আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন; অপর দিকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ম্যাকেনলি ও থিয়োডর

রুসভেল্ট এবং যুক্ত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রশক্তি সচিব মিঃ জন হে, ইত্যাদি প্রতিপত্তিশালী আমেরিকানরা এই পন্থার সমর্থন করেন। এই সঙ্গে সিসিল রোডস্, অ্যাণ্ড্র কারনেগি, লর্ড ব্রাইস ও অন্যান্য খ্যাতনামা লোকেরা আমেরিকান বন্ধুত্বের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করেন; আমেরিকা র ও ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সংবাদপত্রের লেখকরাও এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুসভেল্ট যখন প্যানামা খাল খনন শেষ করেন এবং আমেরিকার নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করেন তখন হইতে ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা দৃঢ়নিশ্চিত হন যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বন্ধুত্বের ফলে ইংরাজের সমূহ লাভেরই সম্ভাবনা। ১৯০৯ সালের পর হইতে (যখন ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ড ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে) ইহা স্থির ছিল যে যদি কোন দিন জার্ম্মানীর সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটে, তখন আমেরিকার আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হইবে; কাজেই দূরদর্শী ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব ঘনীভুত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকেন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে ইংরাজ যদি জাপান ও ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইত এবং ইতালি যদি জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষে হইয়া যুদ্ধ করিত তাহা হইলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া হয়ত যুদ্ধে পরাজিত হইত। এখন এই কথা খুব জোর করিয়া বলিতে

চাই যে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ফ্রান্স, ইংরাজ ও রুষিয়া যদি আমেরিকা হইতে আর্থিক, অস্ত্র-শস্ত্রের ও খাদ্যদ্রব্যাদির সাহায্য না পাইত তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হইত না। ১৯১৭ সালে যখন রুষিয়ায় বিপ্লব হয় এবং বৈপ্লবিক রুষিয়া জার্ম্মানীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে, তখন আমেরিকা যদি ইংরাজ, ফ্রান্স ও ইতালির সাহায্যে না আসিত এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য না পাঠাইত তাহা হইলে হয়ত জার্ম্মানী এ-যুদ্ধে জয়ী হইত। কাজেই যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ১৯১৮ সালে শেষ হয়, তখন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্ব খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

[পনর]

জার্ম্মানী, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুর্কি ১৯১৮ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ কি? প্রধান কারণ এই যে জার্ম্মানীর নেতারা বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিতে ক্রুটী করিয়াছিলেন। ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেটের সময় হইতে বিসমার্কের সময় পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বিশ্বরাজনীতিক নীতি ছিল রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন এবং ইংরাজের সহিত এমন সম্পর্ক রাখা যে ইংরাজ জার্ম্মানীর শত্রুদের সহিত না মিলিত

হয়। ১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে বিস্‌মার্ক পূর্ব্বকথিত নীতি অবলম্বন করিয়াই স্থির হইয়া থাকেন নাই, বরং তিনি যাহাতে ফ্রান্সকে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে 'একঘরে' (isolated) করিতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সালে বার্লিন কন্‌ফারেন্সের সময় রুষিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে প্রথম মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়। রুষিয়ার প্রতিনিধিগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বিসমার্ক রুষিয়ার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি না দেখাইয়া অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডকে সাহায্য করিয়াছিল। রুষ-জার্ম্মান মনোমালিন্য বৃদ্ধি হওয়ায় বিস্‌মার্ক প্রথমে অস্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং অস্ট্রিয়ার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে যদি রুষিয়া অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে তাহা হইলে জার্ম্মানী অস্ট্রিয়ার সপক্ষে সাহায্য করিবে। এই সন্ধির পর বিস্‌মার্ক রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য এক সন্ধি করেন যে জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে না এবং যদি কোন রাজশক্তি রুষিয়াকে আক্রমণ করে জার্ম্মানী তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে না।

বিস্‌মার্কের উদ্দেশ্য ছিল যে জার্ম্মানী অস্ট্রিয়া ও রুষিয়ার মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার শত্রুতার ফলে একটা যুদ্ধ না হয়। বিস্‌মার্ক জানিতেন যে জার্ম্মানীর সাহায্য না পাইলে অস্ট্রিয়া কখনও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিবে না। বিস্‌মার্ক তাই সন্ধি করেন যে যদি অন্য কোন রাজশক্তি

অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে, তখন জার্ম্মানী অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করিবে ; এই সন্ধির ফলে অস্ট্রিয়া জার্ম্মানীর বিনানুমোদনে কখন রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ বিস্‌মার্ক জানিতেন যে যদি রুষিয়া বোঝে যে রুষিয়া অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করিলে জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে তাহা হইলে রুষিয়া একলা অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজি হইবে না। কাজেই বিস্‌মার্ক এই সন্ধিগুলির দ্বারা বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি জানিতেন যে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল ; কাজেই ইতালি যাহাতে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের সন্ধি করে তাহার ব্যবস্থা করেন। ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না ; তথাপি বিস্‌মার্কের চেষ্টায় ইতালি রাজি হয় যে যদি কোন রাজশক্তি অস্ট্রিয়া বা জার্ম্মানীকে আক্রমণ করে তাহা হইলে অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর হইয়া ইতালি যুদ্ধ করিবে এবং যদি কোন রাজশক্তি ইতালিকে আক্রমণ করে তাহা হইলে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়া ইতালির হইয়া যুদ্ধ করিবে।

ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট জার্ম্মান ছিলেন। ভিক্টোরিয়াও নিজে জার্ম্মানবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠকন্যা জার্ম্মান সম্রাটের পুত্র ফ্রেডরিকের (পরে জার্ম্মান সম্রাট) সহিত বিবাহিত হয়। জার্ম্মান ফ্রেডরিকের জ্যেষ্ঠপুত্র উইল্‌হেলম (জার্ম্মান সম্রাট)

ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র; কাজেই জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানীতে একদল লোক এই আশা করিয়াছিল যে জার্ম্মান সম্রাট ফ্রেড্‌রিকের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইবে যে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী একত্র হইয়া রুষিয়া বা ফ্রান্সের অথবা উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। বিস্‌মার্ক এই পন্থার বিরুদ্ধে ছিলেন কারণ তিনি কোন কারণে রুষিয়ার সহিত শত্রুতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্‌মার্ক ইংলণ্ডের সহিত শত্রুতার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের হইয়া রুষিয়ার সহিত শত্রুতা করিতেও রাজি ছিলেন না। বিস্‌মার্কের জীবনী পড়িলে এই কথা বোঝা যায় যে তাঁহার এই ভয় ছিল যে যদি কোন দিন রুষিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে তখন ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ১৮৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবে; এবং যদি জার্ম্মানী ইংরাজের সহিত শত্রুতা করে তাহা হইলে ইংরাজ, ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিত মিলিত হইয়া জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহার ফলে জার্ম্মানীর পরাজয়ের ও পতনের সম্ভাবনা। কাজেই বিস্‌মার্কের বিশ্বরাজনীতির পন্থার মূলে ছিল জার্ম্মানী ও রুষিয়ার বন্ধুত্ব।

যখন জার্ম্মান সম্রাট উইলহেলম্ (Kaiser Wilhelm II) বিস্‌মার্ককে প্রধান মন্ত্রীর (Chancellor) পদ হইতে অপসারিত করেন, তখন বিস্‌মার্ক জার্ম্মানীর কল্যাণের জন্য

তাঁহাকে অনেক করিয়া অনুরোধ করেন যে জার্ম্মানী যেন রুষিয়ার সহিত শত্রুতা না করে। প্রথমতঃ জার্ম্মান সম্রাট উইল্‌হেলম্ রুষিয়াকে এই আশ্বাস দেন যে যদিও বিস্‌মার্ক পদত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অনুসৃত পন্থা (রুষ-জার্ম্মান বন্ধুত্ব) অনুযায়ী জার্ম্মানী বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবে। কিন্তু বিস্‌মার্কের পদত্যাগের পর জার্ম্মানী রুষিয়ার সহিত পূর্ব্বতন বন্ধুত্বের সন্ধি পুনরায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হয়। এই ভুলের ফলে ফ্রান্সের মহাসুযোগ হয় এবং ফ্রান্স ও রুষিয়া এই সন্ধি করে যে যদি কখন ফ্রান্স বা রুষিয়ার জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাহা হইলে উভয়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। বিস্‌মার্ক ফ্রান্স যাহাতে ইওরোপে একঘরে (isolated) হয় তাহার জন্য যত্ন করেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হন ; কিন্তু জার্ম্মান সম্রাট উইলহেলমের ভুলের ফলে ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের সন্ধি হয়।

ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানীর বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ তখন জার্ম্মানীর সহিত ইংলণ্ডের শত্রুতার চিহ্ন ছিল না বরং ঐ সময় ফ্রান্স ও রুষিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ছিল। পরে জার্ম্মান সম্রাট নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং রুষিয়ার সহিত যাহাতে বন্ধুত্ব হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। জার্ম্মানীর বিশ্বরাজনীতিবিশারদ নেতারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যদি রুষিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ও এশিয়াতে রাজত্ব

বিস্তার করিতে ব্যাপৃত থাকে তাহার ফলে রুষিয়ার সঙ্গে জাপান ও ইংরাজের শত্রুতা হইবার খুব সম্ভাবনা। যদি রুষিয়ার সহিত ইংরাজ ও জাপানের শত্রুতা বাড়ে তাহা হইলে রুষিয়া বলকান্ উপদ্বীপে আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতে পারিবে না এবং বাধ্য হইয়া জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুত্ব করিবে। এই পন্থার অনুসরণ করিয়া জার্ম্মান সম্রাট উইলহেলম জাপানের বিরুদ্ধে "হল্‌দে জাতের ভয়" (Yellow Peril) মন্ত্র প্রচার করিতে থাকে। শুধু তাই নয়, জার্ম্মানী রুষিয়ার সঙ্গে এক হইয়া চীনে নিজেদের শক্তি বিস্তারের জন্য জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

বিস্‌মার্কের লক্ষ্য ছিল যে জার্ম্মানী তুর্কিতে যাহাতে কোন প্রকারে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে। ইংরাজ যদি ইজিপ্টে, ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় এবং রুষিয়া কন্‌স্‌তান্‌তিনোপলের দিকে আত্মশক্তি প্রসার করিতে চাহিলে তাহাতে বিস্‌মার্কের কোন আপত্তি ছিল না; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তুর্কিতে আধিপত্য বিস্তার উপলক্ষে যদি ইংরাজ ও রুষিয়ার মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি হয় তাহা জার্ম্মানীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে; এবং যদি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি হয় তবে তাহা জার্ম্মানীর পক্ষে সুবিধাজনক। জার্ম্মান সম্রাট উইলহেল্‌ম বিস্‌মার্কের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া এই স্থির করেন যে জার্ম্মানী যদি তুর্কির

সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে জার্ম্মানীর প্রতিপত্তি বার্লিন হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। তাঁহার এই পন্থায় ইংরাজ-জার্ম্মান শত্রুতার সূত্রপাত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মানীর আর্থিক ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়; ঐ সময় ইংলণ্ডের সঙ্গে রুষিয়ার ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য বাড়িতে থাকে। তখন জার্ম্মানী ইচ্ছা করিলে হয়ত ইংলণ্ডের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিত। জার্ম্মানী যদি রাজি হইত যে যদি কখন রুষিয়া ইংলণ্ডকে আক্রমণ করে বা যদি কখন ইংলণ্ড ও রুষিয়ায় যুদ্ধ হয় তখন জার্ম্মানী ইংলণ্ডের পক্ষে যাইবে তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু জার্ম্মানী তাহাতে রাজি হয় না। যদিও এই সময় রুষিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং ঐ দুই রাজশক্তির জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইবার আশঙ্কা ছিল, তথাপি জার্ম্মান রাজনীতিবিশারদেরা মনে করিয়াছিলেন যে জার্ম্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালির সমবেত শক্তি ফ্রান্স ও রুষিয়ার অপেক্ষা অধিক হইবে। শুধু তাই নয়, জার্ম্মানদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজ ও রুষিয়ার মধ্যে শত্রুতা এত অধিক যে ইংরাজ কখন রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিবে না এবং যদি কোন দিন ফ্রান্স ও রুষিয়া জার্ম্মানীকে আক্রমণ করে হয়ত তখন ইংরাজ জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবে, অন্ততঃ জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইবে না। এ সিদ্ধান্তগুলি যে ভুল প্রমাণিত

হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ জার্ম্মান রাজনীতিবিশারদেরা কার্য্যক্ষেত্রে ভাবপ্রবণ জাতির মত হইয়া প্রকৃত ঘটনা বিচার করেন নাই। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থসাধনই মূল আদর্শ। কাজেই জার্ম্মানী যদি ইংরাজের স্বার্থের পথে দাঁড়ায় বা তাহার জাতীয় উন্নতির বা প্রতিপত্তির অন্তরায় হয় তাহা হইলে ইংরাজ যে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যাইতে দ্বিধা করিবে একথা চিন্তা করে নাই। জার্ম্মানী ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করিতে রাজি না হইয়া ইংরাজের শত্রুতা অর্জ্জন করে, সে সম্বন্ধে ভুল নাই।

যদিও জার্ম্মান সম্রাট উইলহেলম্ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র ছিলেন, তথাপি যখন বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন জার্ম্মানীর জনসাধারণ ও সম্রাট পর্য্যন্ত বুয়রদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে সৌহৃদ্যভাব কমিতে থাকে এবং অনেক ইংরাজ জার্ম্মানীকে ইংলণ্ডের প্রকৃত শত্রু বলিয়া স্থির করে। ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং পরে জাপানের সহিত ইঙ্গ-জাপানী মিত্রতা সন্ধি করে। একথা সত্য যে এই সন্ধি প্রথমতঃ রুষিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পরে উহা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজের সহায় হয়। জার্ম্মানী শক্তিমদে মত্ত হইয়া জাপান ও আমেরিকাকে নগণ্য জ্ঞান করে কিন্তু এই দুই রাজশক্তি ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর পতনের কারণ হয়। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে

কোন রাজশক্তিকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা বা তুচ্ছ মনে করা অনেক সময়ে বিপত্তির কারণ হয়।

জার্ম্মানীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং জার্ম্মান ইংলণ্ডের মনোমালিন্য বৃদ্ধির ফলে জার্ম্মান সম্রাট জার্ম্মান নৌবাহিনী বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ইংরাজের জার্ম্মান বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। ১৯০৪-৫ সালে যখন রুষ-জাপানের যুদ্ধের ফলে রুষিয়ার পরাজয় হয়, তখন ইংরাজের আর রুষিয়ার ভয় থাকে না। সেই সময় জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় ইংরাজ ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয় নাই ;—কারণ ফ্রান্স একলা কখন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না ; এবং যদি ফ্রান্স ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে জার্ম্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করিত। রুষ-জাপানের যুদ্ধে রুষিয়ার পরাজয়ের পর জার্ম্মানী ইওরোপ মহাদেশে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে। কাজেই ইংরাজমহল জার্ম্মানীকে ভবিষ্যতের শত্রু বলিয়া ভীত হয়। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজের যে সমস্ত লক্ষ্য আছে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান লক্ষ্য হইল এই ঃ—যখন কোন রাজশক্তি ইওরোপ মহাদেশে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে, তখন সেই রাজশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজ অন্যান্য রাজশক্তির সহিত যোগ দেয়। এই পন্থা ইংরাজ গত তিনশত বৎসরের অধিক অনুসরণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা কথা বলিয়া লই। যখন স্পেনের রাজশক্তি বিশ্বব্যাপী হয়

তখন ইংরাজ তাহা নাশ বা খর্ব্ব করিবার জন্য হলাণ্ড ও অন্য রাজশক্তির সাহায্য লয়। পরে যখন নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের রাজশক্তি খুব প্রবল হয় তখন ইংরাজ ফ্রান্সের শক্তি নাশের জন্য প্রুসিয়া, অস্ট্রিয়া ও রুষিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। পরে যখন রুষিয়ার রাজশক্তি ইংরাজের আধিপত্যের অন্তরায় হইবে বলিয়া মনে হয় তখন ইংরাজ ফ্রান্সের ও ইতালির সাহায্যে ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধে রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব করে। পরে তৃতীয় নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে যখন ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে, তখন ইংরাজ ফ্রাঙ্কোপ্রুসিয়ান্ যুদ্ধে প্রুসিয়ার পক্ষ লয়। পরে আবার যখন রুষিয়া খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে তখন ইংরাজ জাপানের সাহায্যে উহা খর্ব্ব করে। এই সমস্ত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মান বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ইংরাজ কখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে রুষিয়া ও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে না!

রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর রুষিয়ার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ থাকায় রুষিয়া অন্য রাজশক্তির নিকট হইতে কয়েক কোটি টাকা ধার করিবার চেষ্টা করে। ফ্রান্স ঐ সময়ে রুষিয়ার বিশেষ বন্ধু ছিল, কিন্তু অত টাকা ধার দেওয়া একলা ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রুষিয়ার অর্থ-সচিব কাউণ্ট উইটে (Count Witte) ভাবিয়াছিলেন যে হয়ত জার্ম্মানী রুষিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিয়া

প্রয়োজনীয় টাকা ধার দিবে। কাউণ্ট উইটে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯০৫ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হইতে প্যারিস্ যাইবার পথে জার্ম্মান সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন এবং এ বিষয়ে আলাপ করেন। কাউণ্ট উইটের আদর্শ ছিল যে ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে ইওরোপে কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে না; এবং এই তিন রাজশক্তি একত্র হইয়া এবং একমত হইয়া চলিলে ইওরোপের বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে ইংরাজের প্রতিপত্তি কমিবে। জার্ম্মাণ সম্রাট উইল-হেলম্ কাউণ্ট উইটের পরামর্শে কোন মনোযোগ দেন না এবং রুষিয়াকে টাকা ধার দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। জার্ম্মান সম্রাট মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে তিনি রুষিয়ার জারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দ্বারা জার্ম্মান-রুষিয়ার বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিবেন—এবং জার্ম্মানীর টাকা রুষিয়ার শক্তিবৃদ্ধির জন্য দেওয়া অযৌক্তিক মনে করেন। মোট কথা হইতেছে জার্ম্মান সম্রাট্ এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চাহিয়াছিলেন; এবং সেজন্যই অকৃতকার্য্য হন। জার্ম্মানী যখন রুষিয়াকে টাকা ধার দিতে রাজী হয় না, তখন ফ্রান্স ও রুষিয়া লণ্ডনের ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধারের বন্দোবস্ত করে। এই সময় হইতে ১৯১৪ যুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং পরিণামে উহা জার্ম্মানীর পতনের প্রধান কারণ হয়।

১৯১৪ সালে যখন অস্ট্রিয়ার আর্চ্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনাণ্ড

ও তাঁহার স্ত্রী সারাজেভোতে বোমা দ্বারা নিহত হন তখন যে এই একটি ঘটনা হইতেই অতবড় একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হইবে তাহা অনেকে ধারণা করিতে পারেন নাই। একথা সম্পুর্ণ সত্য যে জার্ম্মানী যদি অস্ট্রিয়াকে বলিত যে জার্ম্মানী কখনো রুষিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, তাহা হইলে অস্ট্রিয়া সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহস পাইত না ; কারণ ইহা সকলেই জানিত যে অস্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে আক্রমণ করিবে এবং রুষিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, এটা অসম্ভব। কাজেই জার্ম্মানী অস্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করিতে চেষ্টা না করায় একটা গুরুতর ভুল করে। দ্বিতীয়তঃ যখন ইংরাজ পররাষ্ট্রসচিব সার এডোয়ার্ড গ্রে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়াকে অনুরোধ করেন যে অস্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার বিবাদ ইওরোপের প্রধান রাজশক্তিদের দ্বারা মিটান উচিত, তখন জার্ম্মানী তাহাতে রাজী হয় নাই ; ইহা জার্ম্মানীর দ্বিতীয় ভুল। তারপর জার্ম্মানী যে রুষিয়ার আক্রমণের পূর্ব্বেই রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এটা তৃতীয় ভুল। জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতেই ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একথা নিশ্চিত সত্য ; কিন্তু জার্ম্মানী ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বেই বেলজিয়মের মধ্য দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে যায়—তাহার ফলে সমগ্র জগতে জার্ম্মান বিদ্বেষ প্রচারিত হয় ; এই হইল চতুর্থ ভুল। অনেকে বলিতে পারেন যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও বেলজিয়মের মধ্যে

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে গুপ্ত সন্ধি পূর্ব্ব হইতেই ছিল; এবং যদি জার্ম্মানী বেলজিয়ম আক্রমণ না করিত তাহা হইলে ফরাসী ও ইংরাজ বেলজিয়মের মধ্য দিয়া জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিতে পারিত। যদি জার্ম্মানী বেলজিয়ম আক্রমণ না করিত এবং বেলজিয়ম দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ না করিত তাহা হইলে ইংরাজের পক্ষে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া বিশেষ সহজ হইত না। ইতালিকে যদি অস্ট্রিয়ার তিরোল প্রদেশের একাংশ দান করা হইত তাহা হইলে ইতালি হয়ত অস্ট্রিয়ার হইয়া জার্ম্মানীর পক্ষে যুদ্ধ করিত; কিন্তু অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী "দান" নীতি * অনুসরণ করিতে চায় নাই; ইহাই হইল তাহাদের পঞ্চম ভুল। যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্ম্মানী যদি সিংটাউ বন্দর ও সানটুং প্রদেশের আধিপত্য পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে হয়ত জাপান জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত না; সুতরাং ইহাও জার্ম্মানীর ভুল। এই ভুলগুলি সত্ত্বেও জার্ম্মানী নিজের শক্তিতে তিন বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া রুমানিয়া ও রুষিয়াকে পরাজিত করে। রুষিয়াকে পরাজিত করিবার জন্য এবং রুষিয়ার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবার জন্য জার্ম্মান সামরিক নেতারা ইংরাজ যেমন তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবী বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করে সেই ভাবে রুষিয়ার

* সাম, দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি পন্থা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যবহার্য্য; ইহা শুক্রাচার্য্য কথিত বহু প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি।

বৈপ্লবিক নেতাদের অর্থ দিয়া সাহায্য করেন এবং জার-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত লেনিন্ ও ট্রটস্কিকে সুইজারলণ্ড হইতে রুষিয়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এই সমস্ত যুদ্ধ জয়ের ফলে জার্ম্মানীর সামরিক নেতারা গর্ব্বে "ধরাকে সরা জ্ঞান" করিয়া রুষিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে খুব কঠোর সন্ধি করেন। যাঁহারা মনে করেন যে জয়ী জার্ম্মানরা শত্রুদের প্রতি কঠোর সন্ধি করিতে না এবং "ভার্সাই সন্ধিটা" বড় কঠোর, তাঁহারা "ব্রেষ্ট লিটভ্স্ক সন্ধি" ও "বুখারেষ্ট সন্ধি"র সর্ত্তগুলি পড়িলে বুঝিবেন যে জার্ম্মানী তাহার পূর্ব্বদিকে বল্টিক প্রদেশ হইতে প্রায় কৃষ্ণ সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত নিজের আয়ত্ত্বে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এই হইল জার্ম্মানীর সপ্তম ভুল। কারণ রুষিয়ার ও রুমানিয়ার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করা সত্ত্বেও জার্ম্মানীকে অন্ততঃ দশ লক্ষ সৈন্য রুষিয়া ও বলকান্ প্রদেশে রাখিতে হইয়াছিল। এই দশ লক্ষ সৈন্য যদি জার্ম্মানীর পশ্চিম দিকে (আমেরিকার সৈন্য আসিবার পূর্ব্বে) প্রয়োগ করা হইত তাহা হইলে হয়ত জার্ম্মানী জয়ী হইতে পারিত অথবা ঐ সৈন্য যদি তুর্কিকে সাহায্য করিত তাহা হইলে হয়ত ইংলণ্ড তুরস্ক জয় করিতে সমর্থ হইত না।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে জার্ম্মানী আমেরিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করে নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে আমেরিকার

জনসাধারণ জার্ম্মানীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল; কিন্তু জার্ম্মানীর অদূরদর্শিতায় আমেরিকার জন-মত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যায় এবং পরে আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; উহার ফলে জার্ম্মানীর যুদ্ধে পরাজয় হয়। ইহা জার্ম্মানীর অষ্টম ভুল।

১৯১৬—১৭ সালে যখন জার্ম্মানী যুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করিতেছিল, তখন ক্যাথলিক জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ চেষ্টা করেন যাহাতে যুদ্ধ সত্বর বন্ধ হয় এবং সন্ধিদ্বারা যুদ্ধ শেষ হয়। সে জন্য তিনি বলেন যে জার্ম্মানী বেলজিয়ম ফিরাইয়া দিবে এবং ফ্রান্সের ইওরোপস্থ কোন দেশ অধিকার করিবে না। বিজয়ী জার্ম্মান নেতারা তখন উহাতে রাজি হন না কারণ তখন তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে বেলজিয়ম নিজেদের অধীনে রাখিবে এবং তাহার আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলিও অধিকার করিবে। বেলজিয়াম জার্ম্মানীর অধিকারে আসিলে জার্ম্মানী অনায়াসে ফ্রান্স ও ইংরাজের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে, এই ধারণা জার্ম্মানীর নেতাদের মনে ছিল। এই হইল জার্ম্মানীর নবম ভুল।

এই সঙ্গে একটা কথা বলিয়া লই। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে সামরিক শক্তি একটা বড় সম্বল। সামরিক শক্তিবিহীন রাজশক্তি অধিকাংশ সময় বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সামরিক শক্তি নাই বলিয়া

ভারতবর্ষের নেতারা যখন ইংরাজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বরাজ-সম্বন্ধে আলাপ করেন তখন ইংরাজ প্রতিনিধিরা সোজা-সুজি বলেন, তোমাদের সামরিক শক্তি নাই, তোমরা তোমাদের দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ নও কাজেই তোমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত নও। ভারতের নেতারা বলেন যে আমাদের সামরিক শিক্ষার সুযোগ দিলে আমরা উপযুক্ত হইব। কিন্তু আসলে সামরিক শক্তি নাই বলিয়াই ভারতবাসীর আবেদন সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য। তবে বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে কেবল সামরিক শক্তির দ্বারাই জয়লাভ হয় না। অনেক সময়ে অনেক রাজশক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হয় কিন্তু পরে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষতার অভাবে জয়ের ফল রক্ষা করিতে পারে না; আবার রণে পরাজিত রাজশক্তি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিচক্ষণতার ফলে প্রকৃত পক্ষে জয়ী হয়। উদাহরণ স্বরূপ, রুষিয়া তুর্কির বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে জয়ী হয় কিন্তু বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া জয়ের ফল পূর্ণভাবে ভোগ করিতে সুযোগ পায় না। ১৮৭৬—৭৭ সালে রুষিয়া তুর্কিকে পরাজিত করিয়া স্যান-ষ্টেফানোর সন্ধি দ্বারা তুর্কির স্বাধীনতা লোপের ব্যবস্থা করে কিন্তু ইংরাজ বিনা যুদ্ধে বার্লিন কংগ্রেসে (১৮৭৮) জার্ম্মানী, অস্ট্রিয়া ও তুর্কির সাহায্যে রুষিয়াকে পরাজিত করে এবং তুর্কির নিকট হইতে সাইপ্রাস্ দ্বীপ লয়। ১৮৯৪—৯৫ সালে জাপান চীনের যুদ্ধে জয়ী হয় এবং প্রথম

সিমোনোসাকির সন্ধি করে কিন্তু পরে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত হয়; এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বূয়র-ইংরাজ সমরে বুয়রেরা পরাজিত হয় কিন্তু বূয়র নেতারা ঐ পরাজয়কে দশ বৎসরের মধ্যে জয়ে পরিণত করে; আজ বূয়র নেতারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের উপর নৈতিক আধিপত্য করিতেছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জাপান জার্ম্মানীকে পরাজিত করিয়া সানটুং প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিবে বলিয়া স্থির করে এবং ভার্সাই সন্ধিতে উক্ত সর্ত্তলাভ করে কিন্তু ওয়াসিংটন্ সভায় (Washington Conference) পরাজিত হয়। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কি পরাজিত হয় কিন্তু লজান কন্‌ফারেন্সে (Lausanne Conference) প্রকৃত পক্ষে জয়ী হয়। মোস্তাফা কামাল পাশার সামরিক জয়ের ভিত্তি হইল বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জয়লাভ। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে আমীর ফইজল্লা ইংরাজের সাহায্যে তুর্কির বিরুদ্ধে জয়ী হয়, কিন্তু বিশ্বরাজনীতির চক্রান্তে ডামস্কাস্ হইতে ফরাসী রাজশক্তির দ্বারা বিতাড়িত হয় এবং আবার বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে জয়ী হইয়া "ইরাকের" বাদ্‌সা হয়। আফ্‌গানি-স্থানের আমীর হবিবুল্লা বিশ্বরাজনীতির চক্রান্তে রুষিয়ার সাহায্যে আফ্‌গানিস্থানকে পূর্ণ স্বাধীন করেন এবং অনেকের মতে ইংরাজকে এক যুদ্ধে পরাজয় করেন; কিন্তু আবার বিশ্বরাজনীতির চক্রান্তে, কোন এক পরাক্রমশালী রাজশক্তি গুপ্তভাবে ভিস্তিওয়ালা বাচ্চাই সাক্কোকে সাহায্য করে বলিয়া,

আমীর হবিবুল্লা কেবল যুদ্ধে পরাজিত হন তাহা নহে, আজ নির্ব্বাসিত হইয়া বিদেশে অতি কষ্টে জীবনযাপন করিতেছেন। রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পর শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রের চক্রান্তে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে নিজের প্রভাব পূর্ণভাবে বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু ১৯৩২ সালে চীনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আত্মপ্রসারের জন্য চেষ্টা করে। যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও জাপানের বিশ্বরাজনীতি চীনের নিকট পরাজিত হয়, কারণ চীন জাপানকে (League of Nations) "লিগ অফ নেসন" হইতে বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য করে। বর্ত্তমানে জাপান "মাঞ্চুকুয়ো" রাজশক্তির দ্বারা মাঞ্চুরিয়াতে নিজের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছে; এ জয় স্থায়ী হইবে কিনা তাহা জাপানের বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে জয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কাজেই একথা মনে রাখা দরকার সামরিক শক্তি ব্যতীত কেবল বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে দক্ষতা দ্বারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না; আবার অনেক সময় সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব হেতু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান জগতের রাজশক্তিগুলির মধ্যে সামরিক শক্তি ও বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে দক্ষতার সামঞ্জস্য ইংরাজ রাজশক্তির মধ্যে অধিকতরভাবে দেখা যায়।

[ষোল]

জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে (১৯১৪—১৮) জার্ম্মানী যেভাবে সমগ্র দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহাতে জার্ম্মান জাতির বীরত্বের ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বিভিন্ন দেশস্থ সোস্যালিষ্টরা এবং সাধারণ শ্রমজীবীরা যুদ্ধ করিতে রাজি হইবে না এবং হয়ত দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট (General Strike) হইবে। জার্ম্মানীতে সোস্যালিষ্টের সংখ্যা ও শক্তি খুব বেশী ছিল, তথাপি যখন যুদ্ধ ঘোষণা হয় তখন তাহারা এই যুদ্ধের পক্ষে মত দেয় কেন? জার্ম্মান সোস্যালিষ্টরা প্রাণে প্রাণে প্রজাতন্ত্রবাদী ছিল; কাজেই তাহারা রুষিয়ার "জারের" অত্যাচারী রাজ্যশাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে রুষিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যদি তথায় বিপ্লব আনা সম্ভব হয় তাহা হইলে রুষিয়াতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী স্থাপন করা সহজ হইবে। শুধু তাহাই নহে; যদি রুষিয়ায় রাজ্যশাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হয় পরিণামে জার্ম্মানীতেও শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন, এমন কি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্টরা, ফরাসী প্রজাতন্ত্র রুষিয়ার "জারের" সহায়ক ছিল বলিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। একথা একেবারে ভুল যে জার্ম্মানীর শ্রমজীবীরা ও

সোস্যালিষ্টরা জার্ম্মানীর পরাজয় প্রত্যাশী ছিল এবং একথা সত্য যে জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্ট ও শ্রমজীবীদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে জার্ম্মানীর পরাজয় হইলে এবং রুষিয়ার জয় হইলে শ্রমজীবিদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জার্ম্মান শ্রমজীবীরা ও জার্ম্মানীর সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে থাকে। যখন ১৯১৭ সালে রুষিয়ায় বিপ্লবের ফলে "জারের" পতন হয়, তখন হইতে অনেক সোস্যালিষ্ট এই সিদ্ধান্তে আসে যে জার্ম্মানীর শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন এবং জার্ম্মানী যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া শান্তির জন্য প্রয়াস করিলে, তাহার ফল মঙ্গলজনক হইবে।

যদিও জার্ম্মানীতে ইহুদিদের সংখ্যা মাত্র ছয় লক্ষ ছিল তথাপি প্রায় ১২০০০ ইহুদি জার্ম্মানীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। জার্ম্মানীর ইহুদিরা জার্ম্মানীর পতনের কারণ, একথা সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ! জার্ম্মানীর পক্ষে প্রায় সমস্ত দুনিয়ার রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড় সহজ ছিল না। অস্ত্র শস্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মাল মসলা জার্ম্মানীকে বিদেশ হইতে আনিতে হইত; এবং ইংরাজ, ফরাসী ও অন্যান্য রাজশক্তির নৌবাহিনী জার্ম্মানীর চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ (blockade) করিলে, বারুদ তৈয়ার করিবার প্রধান মসলা সোরার (Nitrate) বিশেষ অভাব হয়। একথা অনেকে জানেন না, যে একজন জার্ম্মান ইহুদি অধ্যাপক হাভের (Haber)

বায়ুমণ্ডল হইতে Nitrate প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করায় জার্ম্মানীর এবিষয়ে একটা প্রকাণ্ড অভাব দূর হয়। যদি এই ইহুদি অধ্যাপক এই সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে জার্ম্মানী কখন চারি বৎসর যুদ্ধ করিতে পারিত না। জার্ম্মানীর ইহুদিরা নানা উপায়ে জার্ম্মানীর দুর্দ্দিনে সাহায্য করিয়াছে। কাজেই একথা জোর করিয়া বলিতে চাই এবং সত্যের খাতিরে একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে মানিতে হইবে যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয় সোস্যালিষ্টদের দেশদ্রোহিতার ফলে বা ইহুদিদের শত্রুতার ফলে হয় নাই।

১৯১৫ সালের প্রথমেই অনেক জার্ম্মান নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে জার্ম্মানী কখন ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রুষিয়ার সমবেত শক্তিকে পরাজিত করিতে পারিবে না; কিন্তু জার্ম্মানীর জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। ১৯১৫ হইতে জার্ম্মানীর খাদ্যের অভাব হয়; তথাপি শত কষ্ট সহ্য করিয়াও জার্ম্মানীর জনসাধারণ জার্ম্মানীর সামরিক নেতাদের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিয়া চলে। ১৯১৭-১৮ সালে যখন জার্ম্মানীর জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয় যে যুদ্ধে জয় অসম্ভব, তখন তাহারা চিন্তা করে যে যদি যুদ্ধে জয় অসম্ভব তাহা হইলে কেন লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নষ্ট করা এবং কেন এত কষ্ট সহ্য করা; কাজেই যাহাতে যুদ্ধ শেষ হয় এবং সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা করা প্রয়োজন। জার্ম্মান বিপ্লবের

কারণ জার্ম্মানীর পরাজয়ে; জার্ম্মানীতে বিপ্লব হওয়ায় জার্ম্মানী পরাজিত হয়, একথা একেবারে মিথ্যা।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের পর হইতেই জার্ম্মানীর যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা ছিল না এবং যুদ্ধ যদি অধিকদিন চলে তাহার ফলে জার্ম্মানীর শত্রুরা হয়ত জার্ম্মানী আক্রমণ করিয়া, জার্ম্মানীর কারখানা ইত্যাদি নষ্ট করিতে পারে এই আশঙ্কা হয়। তখন মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, জেনারেল লুডেনডরফ্ প্রভৃতি জার্ম্মানীর সামরিক নেতারা স্থির করেন যে কোন উপায়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সাহায্যে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানীর বিপক্ষদল জার্ম্মানদেশের সেই সময়ের শাসকদের সহিত কোন প্রকার সন্ধি করিবে না। এই কথার মূল অর্থ ছিল যে জার্ম্মানীর সম্রাট উইল্‌হেলম যদি সিংহাসনে থাকেন তাহা হইলে কোন সন্ধি হইবে না। এই সমস্যায় জার্ম্মানীর সামরিক নেতারা নিজেরাই এই উপদেশ দেন যে সম্রাট উইল্‌হেলম্ জার্ম্মানী পরিত্যাগ করিবেন এবং জার্ম্মান পার্লামেণ্টের (রাইখ্‌ষ্টাগের) নেতারা নূতন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন। এই সময়ে জার্ম্মান পার্লামেণ্টে সোস্যালিষ্টদের প্রাধান্য থাকায় তাহাদের নেতৃত্বে এবং জার্ম্মান ক্যাথলিক পার্টি ও জার্ম্মান ডেমক্রেটিক পার্টির সাহায্যে জার্ম্মান প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

এ প্রবন্ধে জার্ম্মানীর রাজনীতির কথা বিচার কবা আমার উদ্দেশ্য নয় ; তথাপি কয়েকটা কথা মোটামুটি বলা দরকার। জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ স্থগিত হইবার পর, ভার্সাই সহরে (প্যারিসের নিকটে) সন্ধি করিবার জন্য একটা কনফারেন্স হয়। অতীতে যখন কোন রাজশক্তি যুদ্ধে পরাজিত হইত, তখন সন্ধির সময় পরাজিত রাজশক্তি জয়ী রাজশক্তির সহিত নানাপ্রকার আলোচনা করিবার সুযোগ পাইত এবং তাহার ফলে এমন সন্ধি হইত যাহা পরাজিত রাজশক্তি স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইত। যখন ভার্সাই সন্ধির জন্য কনফারেন্স হয় তখন জার্ম্মান প্রতিনিধিদের কোন প্রকার আলোচনা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। প্রায় ছয় মাস্ অধিবেশনের পর যখন ঐ সন্ধির সার মর্ম্ম স্থির হয় তখন জার্ম্মান প্রতিনিধিদের বলা হয় যে, "এই সন্ধি যদি স্বাক্ষর না কর তাহা হইলে জার্ম্মানীর বিপক্ষ দল পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবে এবং যাহাতে বার্লিন অধিকার করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।" প্রথমে জার্ম্মান প্রতিনিধিরা উক্ত সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজি হয় নাই ; কিন্তু যদি পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয় তবে তাহার ফলে জার্ম্মানীর কারখানা এবং দেশের এক অংশ ধ্বংস হইতে পারে এই আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া জার্ম্মানী উক্ত সন্ধি স্বাক্ষর করে।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি জার্ম্মানীর পক্ষে বিশেষ অন্যায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যখন যুদ্ধ চলিতেছিল (১৯১৪-১৮) তখন জার্ম্মানীর শত্রুদল কতকগুলি গোপন চুক্তি করে এবং

উহার দ্বারা এই স্থির হয় যে জার্ম্মানীর আফ্রিকাস্থ উপনিবেশ গুলি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্য রাজশক্তির মধ্যে ভাগাভাগি বিলি হইবে। ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট হইতে য়্যাল্‌সাস ও লোরেন (Alsace and Lorraine) পুনরায় ফেরত লইবে এবং জার্ম্মানীর পূর্ব্বদিকস্থ কতকগুলি প্রদেশ পোলাণ্ডের হইবে। জার্ম্মানীর উত্তরস্থ একটা প্রদেশ (দক্ষিণ জাট্‌লণ্ড) যাহা পূর্ব্বে ডেনমার্কের ছিল, তাহা ডেনমার্কের হইবে। জার্ম্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুল অর্থ দিতে দাবী করিতে হইবে। জার্ম্মানীর মিত্র অস্ট্রিয়ার সমস্ত রাজ্য বিভিন্ন স্বাধীন রাজশক্তির মধ্যে বিভক্ত হইবে এবং দক্ষিণ তিরোল ইতালির অধীনে আসিবে। বুলগেরিয়া তাহার রাজ্যের অনেকাংশ রুমেনিয়া, সার্ভিয়া ও গ্রীসকে দান করিতে বাধ্য করা হইবে। যদিও হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়া হইতে স্বাধীনতা লাভ করে কিন্তু হাঙ্গেরীর কয়েকটী প্রদেশ জেকোশ্লভিয়া, জুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়াকে দিতে হইবে। তুর্কির সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা করা হইবে। ইংরেজ প্যালেষ্টাইনে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিবে, ফ্রান্স সিরিয়া দখল করিবে এবং ইংরাজের তাঁবে আরবদেশে কয়েকটী আরব রাজশক্তি গঠিত হইবে। এই সব চুক্তিই ভার্সাই সন্ধিতে লিখিত হয় এবং কার্য্যতঃ তাহা পরিণত হয়।

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজের যুদ্ধ করিবার প্রধান কারণ ছিল জার্ম্মানীর নৌশক্তি, বাণিজ্যশক্তি ও ও উপনিবেশগুলি

ধ্বংস করা ; কাজেই যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন জার্ম্মানীর বিশাল নৌশক্তি ইংরাজ নিজে দখল করে এবং জার্ম্মানী যাহাতে ভবিষ্যতে শক্তিশালী নৌবাহিনী ও সামরিক শক্তি গঠন করিতে না পারে তাহার জন্য জার্ম্মানীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। এই সঙ্গে এই কথা মনে রাখা উচিত, যে ইংরাজের দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন জার্ম্মানীর আফ্রিকার উপনিবেশগুলি অধিকার করে; তাহার ফলে ইংরাজ প্রকৃত পক্ষে কেপ অফ্ গুড্ হোপ হইতে কাইরো (ইজিপ্ট) পর্য্যন্ত এক সোজা রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। দূরদর্শী ব্রিটিস্ রাজনীতিবিশারদ সিসিল্ রোডস্ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্বেই ঐ আদর্শ অনুসরণ করিতেছিলেন এবং উহা তখন সম্পূর্ণ হয়। অষ্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটা দ্বীপ (যাহা জার্ম্মানীর ছিল) অধিকার করে। যদিও ভারতবর্ষ অর্থ দিয়া ও প্রাণ দিয়া ইংরাজ রাজ্যকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে, তথাপি জার্ম্মানীর আফ্রিকাস্থ কোন উপনিবেশ ভারতবর্ষ পায় নাই।

পূর্ব্ব কথিত গুপ্ত চুক্তির ফলে জার্ম্মানীর চীনস্থ অধিকার-গুলি জাপানের হইবে, ইহা ভার্সাই সন্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। চীন ইহাতে ভীষণভাবে আপত্তি করে এবং ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হয়। ভার্সাই সন্ধির সার মর্ম্ম যে ন্যায়বিরুদ্ধ সে সম্বন্ধে কোন ভুল ছিল না এবং আমেরিকার তরফ হইতে প্রেসিডেণ্ট উইলসন্ ও অপরে

আপত্তি করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে এই সন্ধির সঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে যাহাতে যুদ্ধ না হইতে পারে; এবং বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে যত ঝগড়া আপোষে মিটমাটের বন্দোবস্তের জন্য "লিগ্ অফ্ নেশনস্" গঠন করিতে হইবে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও অন্যান্য রাজশক্তি প্রেসিডেণ্ট উইলসনের এই আদর্শের সপক্ষে থাকিলেও তাহারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জার্ম্মানীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ, জার্ম্মানীর উপনিবেশ ও কতকগুলি প্রদেশ লয়, এবং যাহাতে জার্ম্মানী পুনরায় শক্তি-শালী হইতে না পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করে। সত্য কথা এই যে জার্ম্মানীকে দাবাইয়া রাখাই ভার্সাই সন্ধির ও "লিগ্ অফ্ নেশন" গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জার্ম্মানরা নাচার হইয়া এই সন্ধি স্বাক্ষর করে; কিন্তু এই সন্ধির সত্ত্বগুলি সময়ে পদদলিত করিয়া আবার মহাশক্তিশালী হইবে এ ইচ্ছা প্রত্যেক জার্ম্মানের প্রাণে প্রাণে লুক্কায়িত ছিল।

[সতর]

জগৎব্যাপী যুদ্ধের পর যখন ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, বুল্গেরিয়া বা তুর্কির কোন অংশ লইতে অস্বীকার করে। ফ্রান্স যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল যে আমেরিকা জার্ম্মানীর আফ্রিকাস্থ কোন উপনিবেশ এবং তুর্কির রাজ্যের কোন অংশ, যেমন

আরমেনিয়া "ম্যানডেট্" (Mandate) স্বরূপ লইবে। আমেরিকা তাহা লইতে অস্বীকার করে। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের পূর্ব্বে ফ্রান্সের তরফ হইতে এই চেষ্টা হয় যে রাইন নদীর দুই তীর সে নিজের অধীনে রাখিবে; অর্থাৎ ফ্রান্স রাইনল্যাণ্ড প্রদেশের অন্ততঃ একাংশ দখল করিবে। ফ্রান্স এবিষয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে বাধা পায়। তখন ফ্রান্স এই দাবী করে যে জার্ম্মানী রাইন প্রদেশে কোন প্রকার দুর্গ বা সামরিক সরঞ্জামের কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে না এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র ফ্রান্সের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সন্ধিস্থাপন করিবে যে যদি কখন জার্ম্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ফ্রান্সের হইয়া যুদ্ধ করিবে। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স প্রথমে "লিগ্ অফ্ নেশন" সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল না; পরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স "লিগ্ অফ্ নেশনের" আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে এই সর্ত্ত লিপিবদ্ধ করে যে "লিগ্ অফ্ নেশনের" কোন সভ্য-রাজশক্তির রাজ্যের কোন অংশ কখন অন্য কোন রাজশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইলে, "লিগ্ অফ্ নেশনের" সমস্ত সভ্যগুলি সেই রাজ্য রক্ষার জন্য সাহায্য করিবে।

প্রেসিডেণ্ট উডরো উইলসন, ইংরাজ-রাজশক্তি ও ফ্রান্সের মত সমর্থন করিয়া (ক) আমেরিকা ফ্রান্সের হইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিবে, ইহা স্বীকার করেন;

(খ) চীনস্থ জার্ম্মানীর সমস্ত সত্ত্ব জাপানের হইবে ইহাও মানিয়া লন, এবং (গ) আমেরিকা "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য হইয়া অন্য সভ্যের রাজ্যরক্ষার জন্য "লিগ্ অফ্ নেশনের" কাউন্সিলের মতানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, একথা স্বীকার করেন। প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্ মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিপত্তি আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে এত প্রবল যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটররা তাঁহার মত মানিয়া ভার্সাই সন্ধির অনুমোদন করিবে।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া লই যে আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রেসিডেণ্টের হাতে এবং প্রেসিডেণ্ট, ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্টের "সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্" বা পররাষ্ট্রসচিব দ্বারা তাঁহার মত কার্য্যে পরিণত করেন; কিন্তু প্রেসিডেণ্ট যদি কোন রাজশক্তির সহিত কোন প্রকার সন্ধি করিতে চান তাহা হইলে ঐ সন্ধিসর্ত্ত সেনেটরদের দুই তৃতীয়াংশের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা আমেরিকার রাষ্ট্রপদ্ধতির একটা প্রধান নিয়ম এবং উহা কোন প্রেসিডেণ্ট ভঙ্গ করিতে পারেন না। কাজেই যখন "ভার্সাই-সন্ধি" অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্ ঐ সন্ধি "সেনেটে" পাঠান তখন তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যত আইরিস্ ও জার্ম্মান-জাত আমেরিকান ছিল তাহারা দাঁড়ায়। তারপর আমেরিকা

চীনের রাজ্যের এক অংশ জাপানকে দিবার জন্য কখন সমর্থন করিতে পারে না, এইভাবে আর একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। চীনের রাজনীতিবিশারদেরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের বিরুদ্ধ দলের লোকদের এ বিষয়ে তলে তলে সাহায্য করে। আমেরিকা অন্য কোন রাজশক্তির জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য না হয় এবং যাহাতে "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য না হয়, তাহার জন্য ভীষণ আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের ফলে ভার্সাই-সন্ধি আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সেনেটের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন ভার্সাই-সন্ধি অনুমোদন করিতে গড়রাজি হয় তখন প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মানীর প্রথম জয় হয়। শুধু তাই নয়, ইহার দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে আমেরিকাস্থ আইরিস্ বংশধরেরা জার্ম্মান-আমেরিকানদের সঙ্গে মিলিয়া আমেরিকার আভ্যন্তরিক ও পররাষ্ট্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে অনেক গণ্ডগোল বাধাইতে পারে।

যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট্ ভার্সাই-সন্ধি অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হয়, তখন প্রেসিডেন্ট উইলসন্ ও ডিমক্রাটিক্ পার্টির অনেক নেতারা আমেরিকা "লিগ্ অফ্ নেশনের সভ্য হইবে কিনা এই কথা ১৯২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের প্রধান প্রশ্ন করেন কিন্তু আমেরিকান ভোটদাতারা প্রেসিডেন্ট উইলসন ও ডিমক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় রিপাবলিকান্ পার্টির জয় হয়। এই জয়ের ফলে

আমেরিকা জার্ম্মানীর সহিত ভিন্ন সন্ধি করে। ইহার পর আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে ভবিষ্যতে আমেরিকা ইওরোপস্থ রাজশক্তিগণের ঝগড়া বিবাদে কোন দলের সপক্ষে বা বিপক্ষে যাইবে না। আমেরিকা নিজ শক্তি —আর্থিক ও সামরিক—বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

[আঠার]

১৯২০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন ভার্সাই-সন্ধি অনুমোদন করিতে গড়রাজি হয় এবং দরকার হইলে ফ্রান্সের হইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, এই সন্ধি অনুমোদন করিতে অস্বীকার করে তখন ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদেরা বিশেষতঃ লয়েড জর্জ্জ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যান। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে, জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর, ফ্রান্সের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়; শুধু তাই নয়, ইংরাজ ও ফ্রান্সের মধ্যে সিরিয়া ও আরব বিভাগ লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হয়। ১৯১৫ সালে ইংরাজ আরব নেতাদের সঙ্গে এক গুপ্ত সন্ধি করে যে যদি আরব বৈপ্লবিকদের সাহায্যে তাহারা তুর্কিকে পরাজিত করিতে পারে তাহা হইলে সমস্ত আরব সাম্রাজ্য এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইবে (অবশ্য ঐ স্বাধীন আরব রাজশক্তি ইংরাজের তাঁবে থাকিবে)। ইংরাজ ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের সহিত এক গুপ্ত সন্ধি করে যে যখন তুর্কির রাজ্য ভাগাভাগি করা হইবে তখন ফ্রান্স সিরিয়া দখল

করিবে এবং ইংরাজ মেসোপোটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইন দখল করিবে। লয়েড জর্জ্জ ও অন্যান্য ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা ফ্রান্স যাহাতে সিরিয়া দখল করিতে না পারে সে সম্বন্ধে আরবদের সহিত চক্রান্ত করিতে থাকেন; কাজেই ফ্রান্স জোর করিয়া সিরিয়া দখল করে। ফ্রান্সের রাজনীতিবিশারদেরা এই সময় স্থির করেন যে ইংরাজ যদি আরবদের সহিত মিলিয়া ফ্রান্সের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য তুর্কির সহিত বন্ধুত্ব করিবে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে জাপান এশিয়াতে আর্থিক ও সামরিকক্ষেত্রে মহাবলশালী হইয়া উঠে। জাপান ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইংরাজকে চীনের বাজার হইতে হটাইতে আরম্ভ করে। এশিয়াতে জাপান ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে, কাজেই কি উপায়ে জাপানের শক্তি খর্ব্ব করা সম্ভব সে সম্বন্ধে অনেক ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা বিশেষ চিন্তা করিতে থাকেন। এই সময়ে এই আশঙ্কা হয় যে যদি কোন দিন জাপানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধে তখন ইংরাজ হংকং নৌ-কেন্দ্র হইতে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না; কাজেই ইংরাজ নৌ-সেনাপতি ভারতবর্ষের ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে একটা সুবিশাল ও মহাশক্তিশালী নৌ-কেন্দ্র গঠনের উপদেশ দেন। এই উপদেশ অনুসারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সিঙ্গাপুরে নৌ-কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগতের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী রাজশক্তি হইয়া উঠে ১৯১৮ সালে যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন আমেরিকায় ৫০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমেরিকাতে এক বিশাল নৌ-বাহিনী গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এবং আর্থিক শক্তিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঐ সময়ে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রও ইংরাজের এক মহা-প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে।

* * * *

রুশিয়ার বিপ্লবের পর যখন বোলসেভিকদল, লেনিন্ ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের নেতৃত্বে এক নূতন কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত রিপাবলিক্ (U. S. S. R.) স্থাপন করে এবং যখন রুষিয়ার দূরদর্শী রাজ-নীতিবিশারদেরা এসিয়ার পদদলিত জাতিদের সহিত বন্ধুত্বের ভাব দেখাইতে প্রস্তুত হন, তখন একদল ইংরাজরাজনীতিবিশারদ এই স্থির করেন যে ইংরাজস্বার্থের তরফ হইতে রুষিয়া বিশেষ মারাত্মক শত্রু। রুষিয়ার দমন বা রুষিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ভবিষ্যতে রুষিয়ার শক্তি নাশ করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন।

এই সমস্ত ব্যাপারে ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা স্থানকালপাত্রভেদে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড নীতি অবলম্বন করেন। প্রথমে ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, আমেরিকান ও অপর ক্ষুদ্র রাজশক্তিগণ সমবেত হইয়া সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের পতনের জন্য সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের বিরোধী রুষিয়ার

বৈপ্লবিকদের (White Russians) অর্থ ও অস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করেন। সোভিয়েত রুষিয়ার রাজনীতিবিশারদেরা স্থির করেন যে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট যদি রুষিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে যুদ্ধ করিতে যায় তাহা হইলে বৈপ্লবিকদের পরাজিত করিতে পারিবে না। তখন তাঁহারা এশিয়ার রাজশক্তিগণের সহিত—চীন, আফ্‌গানিস্থান, পারস্য ও তুর্কির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং সাইবেরিয়ার দিকে জাপান ও আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া কেবল ইওরোপে রুষীয়-বৈপ্লবিকদের দমন করে। সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের জয়ের ফলে রুষিয়ার শক্তিনাশ বা রুষিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পন্থা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যদিও রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব করিতে ইংলণ্ড পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হয় নাই তথাপি ইংরাজের রুষভীতি কম হয়।

এই সময় ইংরাজ রাজনীতিকেরা স্থির করে যে এশিয়াতে জাপানের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে লয়েড জর্জ্জ এই স্থির করেন যে ইংলণ্ডে একটা ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন করিতে হইবে এবং ঐ কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিস্‌ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্ররাজনীতি স্থির করিয়া, ইংরাজ ও আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে একটা আপোষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু লয়েড্‌ জর্জ্জ যখন গুপ্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাব করেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র লণ্ডনে একদল প্রতিনিধি পাঠাইয়া ইংরাজের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে যোগ দিন, তখন আমেরিকা ঐ প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া এই প্রস্তাব করে যে বিভিন্ন বিশ্বরাজনীতিক বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন সহরে একটা আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের অধিবেশন হওয়া দরকার। এই হইল ওয়াশিংটন কনফারেন্সের সূত্রপাত।

[উনিশ]

ওয়াশিংটন্ কন্ফারেন্সে অনেক বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হয়; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রধান :—(ক) ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে নৌবাহিনী সম্বন্ধে চুক্তি (খ) য়্যাংলো-জাপানিজ্ য়্যালায়েন্সের শেষ ও উহার স্থানে ইংরাজ-জাপান-ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধীয় একটা চুক্তি, (গ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, পোর্ত্তুগাল্, চীন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচ্যে শান্তি রক্ষার জন্য চুক্তি (ঘ) চীন ও জাপানের মধ্যে ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কীয় ব্যাপারি লইয়া যে গণ্ডগোল ছিল তাহা মিটমাট, (ঙ) চীনে সকল রাজশক্তির ব্যবসা করিবার সমান সুযোগ

(Open Door Policy) সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুনরায় মানিয়া লওয়া হয়।

যে কোন জাতি যে কোন সময়ে বিশ্বব্যাপী রাজ্য সংস্থাপন করে, তাহার পক্ষে নৌ-শক্তি একটা প্রধান সম্বল। কাজেই ইংরাজ রাজশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রারম্ভে এই স্থির করে যে ইংরাজ নৌ-বাহিনী জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী হইবে এবং এই নৌশক্তি অন্য কোন দুই রাজশক্তির নৌবাহিনীর সমবেত শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে জার্ম্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসই ইংরাজ ও জার্ম্মানীর মধ্যে মনোমালিন্যের প্রধান কারণ। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে যদিও জার্ম্মানীর নৌশক্তি একেবারে নাশ পায় এবং ফ্রান্স ও ইতালির নৌশক্তি বৃদ্ধি পায় তথাপি ১৯১৭ সালে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের নেতারা এক বিশাল নৌবাহিনী গঠনের জন্য ব্যবস্থা করেন; ১৯২০ সালে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বে আমেরিকার নৌশক্তি খুব প্রতাপশালী হইয়া উঠে এবং আমেরিকা যদি আরও রণতরী নির্ম্মাণ করিতে থাকিত তাহা হইলে নৌশক্তিতে ইংরাজ আমেরিকা অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। শুধু তাই নয়, ১৯২০ সালে আমেরিকার অর্থবল এত বেশী ছিল যে দুনিয়ার মধ্যে অন্য কোন রাজশক্তি আমেরিকার সহিত রণতরী বাহিনী নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম ছিল না। কাজেই ইংরাজ রাজনীতিবিশারদদের

এই ভাবনা হয় যে কি উপায়ে আমেরিকার বিশাল রণতরী বাহিনী ইংরাজের রণতরী বাহিনী অপেক্ষা বড় হইয়া না উঠে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে জাপানের সামরিক শক্তি খুব বাড়িয়া যায়; জাপান ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে বিশেষভাবে কৃতকার্য্য হয়। এমন কি চীন ও ভারতবর্ষে জাপানের বাণিজ্য ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। যদিও জাপান প্রায় বিশ বৎসর ইংরাজের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সন্ধির দ্বারা আবদ্ধ ছিল, এবং যদিও ইংরাজ জাপানের সাহায্যে ইংরাজ, রুষিয়া ও জার্ম্মানীকে পরাজিত করিয়া আত্মস্বার্থ রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পর ইংরাজ বিশ্বরাজনীতি-বিশারদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি ইংরাজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। কাজেই ইংরাজ জাপানের নৌ-শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। অপর দিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের নৌশক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমেরিকার রাজনীতিবিশারদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যদি ইংরাজ ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্বসন্ধি বজায় থাকে তাহা হইলে যদি কোন দিন আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে ইংরাজের নৌশক্তি জাপানের সাহায্যে যাইতে পারে; এবং আমেরিকাকে আট্‌ল্যান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে ইংরাজ ও জাপানী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। কাজেই আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্য খুব

বলশালী ও বিশাল নৌবাহিনী গঠন করা প্রয়োজন। যখন ইংরাজ-বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা আমেরিকার নেতাদের সহিত আমেরিকার বিশাল নৌ-বাহিনী গঠন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করে, তখন আমেরিকা প্রথম এই দাবী করে যে ইংলণ্ড যদি আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী হয় তাহা হইলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে প্রথমে ইংলণ্ড-জাপানের বন্ধুত্ব সন্ধি রদ করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমেরিকা ইংলণ্ডের সমান নৌবাহিনী গঠন করিয়া ক্ষান্ত হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইঙ্গ-জাপানি সন্ধি রদ করিতে রাজি হয় নাই এবং জাপান গভর্ণমেণ্টও চেষ্টা করে যে যাহাতে উক্ত সন্ধি রদ না হয়। কিন্তু ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও নিউজীলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট পরামর্শ দেয় যে যদি ইংলণ্ড জাপানের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সন্ধি রাখে তাহা হইলে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িবার খুব সম্ভাবনা; কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডকে জাপানের সহিত বন্ধুত্ব সন্ধি (Anglo-Japanese alliance) ত্যাগ করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের অনেক নেতা মনে মনে স্থির করেন যে ইওরোপে ফ্রান্স, এশিয়ায় জাপান এবং আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের ভবিষ্যতে হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে; কিন্তু এই তিন রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব।

তাঁহারা আরও চিন্তা করেন যে প্রথম জাপানের শক্তি খর্ব্ব করা দরকার এবং ইওরোপে ফ্রান্সের যাহাতে শক্তি না বাড়ে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; কাজেই ইংলণ্ড যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে তাহা হইলে আমেরিকার সাহায্যে জাপানকে দমন এবং ফ্রান্সের শক্তি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইবে। ইংলণ্ডের নেতারা বিশেষতঃ লয়েড জর্জ্জ ও মিঃ ব্যালফোর (পরে আর্ল ব্যালফোর) এই মত সমর্থন করেন। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স বসিবার পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা (চার্লস্ এভান্স হিউজ, তৎকালীন আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব ইত্যাদি) ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নেতারা বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একমত হয়েন। কাজেই যখন কনফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হয়, তখন মিঃ হিউজ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের তরফ হইতে এই প্রস্তাব করেন যে জগতে পাঁচটী প্রধান নৌ-শক্তির নৌ-বাহিনীর শক্তি এই অনুপাতে হইবে ঃ—আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রত্যেকে ৪, জাপান ৩, ফ্রান্স ও ইতালি প্রত্যেক ১.৭৫। জাপানের নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে জাপান যদি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে হয়ত ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একত্র হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যাইতে পারে। কাজেই জাপান এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে ইহা স্থির করে যে যদি

আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরে নূতন নৌ-দুর্গ গঠন করা বন্ধ করে তাহা হইলে জাপান এবিষয়ে রাজি হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ও গোয়ামদ্বীপে নৌ-দুর্গ গঠন বন্ধ করিতে রাজি হয়; কিন্তু ইংরাজ সিঙ্গাপুরে নৌ-দুর্গ গঠন বন্ধ রাখিতে অসম্মত হয়। জাপান বাধ্য হইয়া ইংরাজ ও আমেরিকার অপেক্ষা কম নৌ-শক্তি গঠন বিষয়ে রাজি হয়।

যখন ফ্রান্সকে ১.৭৫ অর্থাৎ ইংলণ্ড অথবা আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের ⅓ অংশ এবং ইতালির সমান নৌ-বাহিনী গঠন সম্বন্ধে রাজি হইবার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন ফ্রান্স প্রথম হইতে এ বিষয়ে গররাজি হয়; কারণ ফ্রান্সের উপনিবেশ জাপানের অপেক্ষা অধিক, কাজেই তাহার নৌ-শক্তি জাপানের অপেক্ষা কম হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স কখন ইতালিকে নৌ-শক্তি বিষয়ে সমান স্থান দিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ঐ সময় বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ফ্রান্স ইংলণ্ডের ও আমেরিকার নিকট বিপুল অর্থ ঋণ করিয়াছিল এবং ফ্রান্স যদি ইংরাজের ও আমেরিকার প্রস্তাবে রাজি না হইত তাহা হইলে, ইংলণ্ড, ইতালি ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যাইতে পারিত। কাজেই ফ্রান্সের পক্ষে উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। যখন ফ্রান্স পুনঃপুনঃ জেদ করে যে তাহার নৌ-শক্তি জাপানের সমান হওয়া আবশ্যক তখন

ইংরাজ উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ইংরাজ বলে যে যদি ফ্রান্সের নৌ-শক্তি জাপানের সমান হয় এবং যদি ইতালির নৌ-শক্তি ফ্রান্সের সমান হয় তাহা হইলে ফ্রান্স ও ইতালির সমবেত নৌ-শক্তি অথবা ফ্রান্স ও জাপানের সমবেত শক্তি ৬ হইবে এবং ইংরাজের নৌ-শক্তি মাত্র ৫ হইবে ; কাজেই যদি কোন-দিন ফ্রান্স ও ইতালি অথবা ফ্রান্স ও জাপান ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইংরাজের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা। ইংরাজ ইতালির পক্ষ সমর্থন করাতে (অর্থাৎ ইতালির নৌ-শক্তি ফ্র্যান্সের তুল্য হইবে) ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে বেশ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

যদিও ইংরাজ ও আমেরিকা যুক্তভাবে এবং ওয়াশিংটন কনফারেন্সে জাপান ও ফ্রান্সের নৌ-শক্তি খর্ব্ব করিতে কৃতকার্য্য হয় তাহাতে কিন্তু জাপান ও ফ্রান্সের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্বের বীজ বপন করা হয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে ১৯০৯ সাল হইতে জাপান ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সন্ধি ছিল এবং ঐ সন্ধি ওয়াশিংটন কনফারেন্সের সময় ঘনিষ্ঠতর হইয়া দাঁড়ায়। জাপান ও ফ্রান্সকে নূতন সন্ধি করিতে হয় নাই ; তবে ঐ পুরাতন সন্ধির সঙ্গে হয়ত অন্য গুপ্ত সন্ধি পরে স্বাক্ষর করা হইয়াছে। যখন ইঙ্গ-জাপানিজ য়্যালায়েন্স ইংরাজ ত্যাগ করে এবং ইংরাজ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হয় তখন হইতে আত্ম-

রক্ষার জন্য এবং জাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য জাপান ও ফ্রান্স বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়।

যখন ইংরাজ ইঙ্গ-জাপানি য়্যালায়েন্স ত্যাগ করে, তখন জাপান যাহাতে অন্য রাজশক্তির সহিত (বিশেষতঃ রুষিয়া বা ফ্রান্সের সহিত) মিলিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় বা জাপান যাহাতে আমেরিকার সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না হয়, তজ্জন্য ইঙ্গ-জাপানি সন্ধির পরিবর্ত্তে ইংরাজ, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে এই সন্ধি হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত বিশ্বরাজনৈতিক ব্যাপারে এই রাজশক্তি চতুষ্টয় পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করিবে। এই সন্ধিই Four Power Pact. ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম্, ইতালি, পর্ত্তুগাল, হলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান —এই নয়টী রাজশক্তি এই সন্ধি করে যে তাহাদের কেহ চীনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না এবং চীনে যে সকল রাজশক্তির ব্যবসা বাণিজ্য রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। এই সম্পর্কে জাপান ও চীনের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে এই সিদ্ধান্ত করেন যে চীন ও জাপানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জাপান চীনদেশে জার্ম্মানীর যে সমস্ত সত্ত্ব পাইয়াছিল (যথা সিংটাও বন্দর ও সানটুং ইত্যাদি) তাহা চীনকে ফিরাইয়া দিবে।

ওয়াশিংটন কনফারেন্সে এই স্থির হয় যে চীনে Open Door Policy নীতি যেন কোন রাজশক্তি লঙ্ঘন না করে। এই পুরাতন কথা ওয়াশিংটন কনফারেন্সে তুলিবার প্রধান কারণ ছিল এই ঃ—আমেরিকা ১৯১৭ সালে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে যোগ দিবার পূর্ব্বে জাপানের সঙ্গে (Ishii-Lansing Agreement) "ইসি-ল্যান্‌সিং" সন্ধির দ্বারা এই কথা মানিয়া লয় যে জাপান-রাজ্যের সন্নিকটস্থ চীন-প্রদেশে অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিশেষ অধিকার বা সত্ত্ব (special interest) আছে। পাছে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইংলণ্ডের ব্যবসা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কমিয়া যায় তজ্জন্য এই স্থির হয় যে চীনে বিশেষতঃ মাঞ্চুরিয়ায় রেল নির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের জন্য চীন যদি কোন টাকা ধার করে তবে তাহা কোন একটি রাজশক্তির নিকট হইতে না করিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইবে।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স বর্ত্তমান জগতের বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করে। এই কনফারেন্সের ফলে (১) ইংরাজকে এই কথা মানিতে হয় যে বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে নৌ-শক্তিতে ও অর্থনীতিক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ইংরাজ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়; (২) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ওয়াশিংটন কনফারেন্স পর্য্যন্ত জাপানের বিশ্ব-

রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল—ইংরাজের সহিত সদ্ভাব স্থাপন; কিন্তু ওয়াশিংটন কনফারেন্সে জাপানীরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে যে ভবিষ্যতে ইংরাজ ও জাপানীর মধ্যে শত্রুতা নিশ্চিত। তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে হয়ত বিশ্বরাজনীতির চক্রান্তে ইংরাজ, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সাহায্যে জাপানীদের একঘরে করিতে পারে (Isolation of Japan in World Politics)। কাজেই ইংরাজ-জাপানী মনোমালিন্যের সূত্রপাত এবং ফরাসী-জাপানী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আরম্ভ হয়; (৩) ওয়াশিংটন কনফারেন্সের ফলে চীনের নেতৃবর্গ ইংরাজ ও আমেরিকার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাপানের নিকট হইতে সিংটাও, সান্টুং ইত্যাদি ফেরত পায়। জাপানের নেতাদের মধ্যে এইরূপ ধারণা ছিল যে উহার ফলে হয়ত চীন ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে; কিন্তু চীনের মধ্যে একদল নেতা এই মনে করেন যে ভবিষ্যতে যদি চীন, আমেরিকা ও ইংরাজ এই তিনটী শক্তি মিলিত হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে জাপানের সকল শক্তি বিনষ্ট হইবে এবং চীনের জাপান ভীতি দূরীভূত হইবে; (৪) ওয়াশিংটন কন্ফারেন্সে জাপান বুঝিতে পারে যে যদি ইংরাজ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে জাপানকে বাধ্য হইয়াই রুষিয়া ও অন্যান্য রাজশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে জাপানের পক্ষে ইঙ্গ-জাপানিজ্ য়্যালায়েন্সের যুগ ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে শেষ হয় এবং জাপানকে বাধ্য হইয়া বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। জাপান যাহাতে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর মত একঘরে না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য নিজ শক্তিবিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ইংরাজের ধারণা ছিল যে ওয়াশিংটন কনফারেন্সের ফলে ইংরাজের জাপান ভীতি দূর হইবে; এই আশাটা কেবল কয়েক বৎসরের জন্যই পূর্ণ হয়। এই কারণে বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যকুশলতার ফলে জাপান বর্ত্তমানে ইংরাজের ভয়ে ভীত নয়।

[বিশ]

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে (১৯১৪) ফ্রান্স, ইংরাজ ও রুষিয়ার মধ্যে এক গুপ্ত সন্ধি হয়। তুর্কি-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করা হইবে—ইহাই ছিল এই সন্ধির মূল মর্ম্ম। রুষিয়াকে কনস্‌তান্তিনোপল অধিকার করিতে দেওয়া হইবে, ইংরাজ প্যালেষ্টাইন্ ও মেসোপটেমিয়াতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিবে এবং ফ্রান্স সিরিয়া অধিকার করিবে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে তুর্কির পূর্ব্বকথিতাংশও তুর্কির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। কনস্‌তান্তিনোপল রুষিয়াকে

না দিয়া উহা এক আন্তর্জ্জাতিক কমিটীর অধীনে আনা হয়। আরব দেশ তুর্কির নিকট হইতে স্বাধীন হইয়া যায় এবং তুর্কির সাম্রাজ্য য়্যানাটোলিয়াতে মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে যখন তুর্কির নিকট এই মর্ম্মের সন্ধির প্রস্তাব করা হয় তখন তুর্কির একদল নেতার মনে এই ধারণা জাগে যে ঐ সন্ধি স্বাক্ষর করা ব্যতীত উপায় নাই ; কিন্তু মোস্তাফা কামাল পাশা ও তাঁহার সহকারীরা সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া তুর্কির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। ঐ সময় সিরিয়া ও আরব সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মতের মিল ছিল না। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ ঐ সময় ফ্রান্সের বিদ্বেষী ভাব ও জার্ম্মানীর পক্ষপাতিত্বের ভাব প্রকাশ করেন, কাজেই ফ্রান্স, তুর্কির ব্যাপারে ইংরাজের কর্ম্ম পন্থার বিরুদ্ধবাদী হয়। ইংলণ্ড স্বয়ং তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না, তবে গ্রীসকে তুর্কির বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে বলিয়া আশ্বাস দেয় এবং গ্রীসের নেতা ভেনেজেলোসের বড় রকম আশা ছিল যে হয়ত তিনি ইংরাজের সাহায্যে স্মীর্ণা সহর এবং এশিয়া মাইনরের একাংশ অধিকার করিতে পারিবেন। গ্রীস ইংরাজের সাহায্যে তুর্কির একাংশ অধিকার করিবে অথচ ইতালি এসিয়া মাইনরে কোন স্থান পাইবে না, ইহা ইতালির মনঃপূত হয় নাই, কাজেই ইতালি অন্তরে অন্তরে গ্রীসের বিরুদ্ধে এবং তুর্কির পক্ষে যায়। অপরদিকে

ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল যে বাকু ও বাটুম্ প্রদেশ, এমন কি জর্জ্জিয়া রুষিয়ার নিকট হইতে কোন উপায়ে লইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস সাধনের জন্য রুষিয়ার বৈপ্লবিকদের সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিল, কাজেই রুষিয়ার সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট গ্রীক ও ইংরেজের বিরুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়।

প্রথমে লয়েড জর্জ্জ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই প্রস্তাব করেন যে মোস্তাফা কামালকে দমন করিবার জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালির সমবেত শক্তি দ্বারা তুর্কিকে আক্রমণ করা হউক। ফ্রান্স ও ইতালি তাহাতে অস্বীকৃত হয়; এমন কি ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা লয়েড জর্জ্জের প্রস্তাব বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে। এই অবস্থায় তুর্কি ও গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে তুর্কির জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মোস্তাফা কামাল পাশা রুষিয়া ও ফ্রান্সের নিকট হইতে বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াতে এবং তুর্কির স্বদেশভক্ত সেনাদের অসীম বীরত্বের ফলে গ্রীসের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। তাহার ফলে ইংরাজ ও অপর রাজশক্তিগুলি লোজানের সন্ধি দ্বারা তুর্কির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়; তুর্কিতে ইতিপূর্ব্বে যে বৈদেশিকদের বিশেষ সত্ব (Extra-territorial Rights) ছিল, তাহা উঠিয়া যায়; প্রবাসী গ্রীকদের তুর্কি পরিত্যাগ

করিতে হয় এবং গ্রীসস্থ মুসলমান তুর্কদের স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বন্দোবস্ত হয়। তুর্কির এই বিজয়ের পর তাহাদের মধ্যে একটা নবজীবন দেখা দেয়। আজ নবীন তুর্কি জাপানের মত উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

মোস্তাফা কামাল পাশা প্রথমতঃ আঙ্গোরা সহরে তুর্কির রাজধানী স্থাপন করেন এবং এই সিদ্ধান্ত করেন যে অতীতের রাজ্যক্ষয়ের কথা চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমানের তুর্কির এই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন। তিনি একদিকে তুর্কির আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য ও জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন; অপর দিকে রুষিয়া ও ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পরে পারস্য ও আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তুর্কি ইতালির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পরে ইতালির সাহায্যে গ্রীসের সহিত মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপন করে। তুর্কি বর্ত্তমানে ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়—ইংরাজ যদি তুর্কির সহিত বন্ধুত্ব করিতে চায়, তুর্কি তাহাতে প্রস্তুত এবং বর্ত্তমানে তুর্কির সহিত ইংলণ্ডের বন্ধুভাব পূরামাত্রাই আছে। সম্প্রতি তুর্কি, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লোভিয়ার সহিত যাহাতে সন্ধিসূত্রে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বলকানে যেন কোন যুদ্ধ না বাধে, ইহাই তুর্কির বর্ত্তমানে প্রয়াস; কারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কোন জাতি প্রকৃত উন্নতি করিবার অবকাশ পায় না।

তুর্কি প্রথমে "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য হইতে রাজী হয় নাই ; কিন্তু পরে যখন এই ধারণা হইল যে লিগ্ অফ্ নেশনের সভ্য হইলে তুর্কির কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই তখন হইতেই তুর্কি "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য হইয়াছে। মোস্তাফা কামাল পাশা তুর্কিতে "খালিফাৎ" নাশ করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন ; দেশের মধ্যে জনসাধারণের উন্নতির জন্য বিবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বর্ত্তমানের উন্নতিশীল তুর্কির আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা সত্য যে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে এই বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বর্ত্তমানের তুর্কি বাঙ্গলার চেয়ে অনেক ছোট এবং উহার জনসংখ্যা বাঙ্গলার এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম ; কিন্তু বর্ত্তমানের তুর্কি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী। গত দশ বৎসরের মধ্যে তুর্কিরাজ্যে রেল পথ বিস্তার হইয়াছে, শিল্পবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সামরিক শক্তি, নৌ-বাহিনী ও বিমান বহর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুর্কিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বিদ্যার প্রচার খুব বাড়িয়াছে। আজ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাজশক্তি ইংরাজ, ফ্রান্স, রুষিয়া ও ইতালি—তুর্কির প্রতি সদ্ভাব প্রকাশের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। তুর্কির পররাষ্ট্র রাজনীতিক্ষেত্রের পন্থা এই :—নিজের জাতীয় মর্য্যাদা ও

স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া শান্তির চেষ্টা করা। দরকার হইলে তুর্কি যুদ্ধ করিতে বিমুখ নয়; তবে যদি আর দশ বৎসর কোন যুদ্ধে নামিতে না হয় তাহা হইলে তুর্কির আর্থিক ব্যাপারে ও শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে উন্নতি সহজসাধ্য হইবে—তুর্কির প্রকৃত জাতীয় উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে তুর্কির পরাজয়ের প্রধান কারণ এই যে ভারতীয় সৈন্য ইংরাজের হইয়া যুদ্ধ করে এবং তুর্কির পূর্ব্বতন প্রজা আরবেরা ইংরাজের সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যুদ্ধকালে ইংরাজ যদি ভারতবাসী ও আরবদের সহায়তা না পাইত তাহা হইলে তুর্কিকে পরাজিত করা সম্ভব হইত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। দূরদর্শী মোস্তাফা কামাল পাশা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এশিয়ার লোকে যাহাতে তুর্কির শত্রু না হয় বরং তুর্কির সহিত এশিয়ার অন্যান্য জাতিদের সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় তাহা করিলে তুর্কির পক্ষে মঙ্গল। এই কারণে মোস্তাফা কামাল পাশা স্বর্গতঃ আমির ফইসালকে বন্ধু ভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং ইরাণের বাদসা রিজা শাহ্ পল্লভির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান। তুর্কিতে যে উন্নতির স্রোত চলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য ভারতীয় নেতারা, বিশেষতঃ যুবক ও যুবতীদলের নেতারা তুর্কি ভ্রমণে গেলে অনেক শিখিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে কোন ভুল নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুর্কিতে ধর্ম্মের গোঁড়ামী একেবারে উঠিয়া

গিয়াছে এবং তুর্কির নিকট হইতে ভারতের ধর্ম্মের গোঁড়াদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

জাতীয় উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের নিকট হইতে যাহা শিখিবার আছে তাহা শিখিবার জন্য তুর্কিদের মধ্যে বিশেষ প্রয়াস চলিতেছে। কনস্তান্তিনোপল বিশ্ববিদ্যালয় নূতন করিয়া সংগঠিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা অধ্যাপককে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে প্রয়াসী তাঁহারা তুর্কির এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রণালী হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিবেন।

[একুশ]

বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্সের বিশ্বরাজনীতি-পন্থা কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ফ্রান্সের সহিত অন্যান্য রাজশক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের কর্ম্মপন্থা কি, তাহাও বিচার করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি ইহাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যখন জগৎব্যাপী যুদ্ধ শেষ হয় এবং ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তখন হইতে ফ্রান্সের বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রের প্রধান লক্ষ্য এই যে, যে কোন উপায়ে তাহার জয়ের ফল রক্ষা করা। ফ্রান্সের রাজনীতিবিদগণ খুব ভাল করিয়া জানে যে গত জগৎব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স যদি ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রুষিয়া, ইতালি ও অন্যান্য রাজশক্তির সাহায্য না পাইত তাহা হইলে জার্ম্মানী ফ্রান্সকে অনায়াসেই পরাজিত করিত। গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মানী ফ্রান্সের সীমান্তে যুদ্ধ করে এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের শত শত গ্রাম ও সহর একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ফ্রান্সের জনসংখ্যা মাত্র চার কোটী ; জার্ম্মানীর জনসংখ্যা অন্ততঃ সাড়ে ছয় এবং জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিক শক্তি ও শিল্পশক্তি ফ্রান্সের অপেক্ষা অধিক। কাজেই জার্ম্মানী যদি সুযোগমত ফ্রান্সকে আক্রমণ না করে এবং সেই সময় ফ্রান্স

যদি অন্য কোন রাজশক্তির সাহায্য না পায়, পক্ষান্তরে জার্ম্মানী যদি অন্য রাজশক্তির সহায়তা লাভ করে, তাহা হইলে ফ্রান্স কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। কাজেই ফ্রান্সের বিশ্বরাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। জার্ম্মানী যাহাতে শক্তিশালী না হইয়া উঠে এবং অন্য কোন প্রবল রাজশক্তির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পায় পক্ষান্তরে অন্য রাজশক্তির সাহায্যে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি হয় ইহাই হইল ফ্রান্সের আত্মরক্ষার অর্থ।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রীয় পন্থার উদ্দেশ্য ছিল যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে এমন একটা সন্ধি করার প্রয়োজন যে যদি কখনও ফ্রান্সকে জার্ম্মানী আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সাহায্যে আসিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড যখন ঐ সন্ধি অনুমোদন করিতে রাজী হয় না, তখন ফ্রান্স আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য রাজশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-সন্ধি করিতে চেষ্টা করে।

ইওরোপের প্রবল রাজশক্তির মধ্যে ইংলণ্ড যখন ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করিতে অসম্মত হয়, তখন ইতালিও ফ্রান্সের প্রতি বন্ধুত্ব ভাব প্রকাশ করিতে রাজী হয় নাই। ইতালির এই আশা ছিল যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে আফ্রিকাতে ও এশিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ ঘটিবে; কিন্তু ফ্রান্স এবিষয়ে ইতালিকে সাহায্য করে নাই;

কাজেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্‌সে ফ্রান্স যখন ইতালি অপেক্ষা বৃহত্তর নৌ-বাহিনীর জন্য দাবী করে তখন ইতালি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও রুষিয়া একত্র হইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু রুষ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যখন সোভিয়েত রুষিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হয় ও পৃথক শান্তি-সন্ধি করে, এবং সোভিয়েত রুষিয়া ফ্রান্সের প্রদত্ত ঋণ শোধ করিতে অস্বীকৃত হয় প্রকৃতপক্ষে তখন হইতে ফ্রান্সের ও রুষিয়ার মধ্যে শত্রুতা আরম্ভ হয়।

ফ্রান্স যখন দেখিল যে ইংলণ্ড, ইতালি ও রুষিয়া তাহার সহায় হইবে না, তখন নিরুপায় হইয়া তাহার রাজনীতিবিদগণ এই সিদ্ধান্ত করে যে ইওরোপের যে সমস্ত ক্ষুদ্র রাজশক্তি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করাই একান্ত প্রয়োজনীয়। এই নীতির ফলে ফ্রান্স একে একে বেলজিয়ম, পোলাণ্ড, জেকোশ্লাভোকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি করে। এই সন্ধিগুলির উদ্দেশ্য যে যদি কখনও জার্ম্মানী ফ্রান্সকে অথবা পূর্ব্বকথিত কোন এক রাজশক্তিকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারা সকলে একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর

হইবে। কাজেই ফ্রান্স, বেলজিয়ম, পোলাণ্ড, জেকোশ্লোভকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করে, ইহাই ফ্রান্সের পররাষ্ট্র রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

ফ্রান্স যাহাতে "লিগ্ অফ নেশনের" মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহার জন্যও বিশেষ যত্নবান্ হয়। "লিগ অফ নেশনের" একটা লক্ষ্য এই যে যদি কোন রাজশক্তি, "লিগ্ অফ নেশনের" কোন সভ্যকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে "লিগ অফ নেশনের" কাউন্সিলের অনুজ্ঞা মত "লিগ অফ নেশনের" সমস্ত সভ্য মিলিত হইয়া আক্রান্ত রাজশক্তিকে সাহায্য করিবে। ফ্রান্স প্রথমতঃ এই চেষ্টা করে যে যাহাতে জার্ম্মানী স্বেচ্ছায় একটা সন্ধির দ্বারা নিজে মানিয়া লইবে যে সে ভবিষ্যতে য়্যালসাস্ ও লোরেনের উপর কোন প্রকার দাবী করিবে না। ফ্রান্স জার্ম্মানীর সহিত উক্ত চুক্তি করিবার পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত করে যে কেবল জার্ম্মানীর কথার উপর বিশ্বাস করা অপেক্ষা অন্য ইওরোপীয় রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাজেই ফ্রান্স এই প্রস্তাব করে যে জার্ম্মানী যেমন ফ্রান্সের য়্যালসাস্ ও লোরেন বা অন্য রাজ্য আক্রমণ করিবে না, তেমনি ফ্রান্সও জার্ম্মানীর কোন রাজ্য অধিকার করিবে না; এবং যদি ফ্রান্সের ও জার্ম্মানীর মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব হয় তাহা হইলে উহা বিনা যুদ্ধে আপোষে মীমাংসার বন্দোবস্ত করিবে। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যদি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ

বাধে, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ইতালি আক্রান্ত রাজশক্তিকে সাহায্য করিবে। এই সন্ধি লোকার্নোর সন্ধি (Locarno Pact) বলিয়া বিখ্যাত। স্বর্গীয় জার্ম্মান পররাষ্ট্রসচিব ডাক্তার ষ্ট্রেস্ম্যান, ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব স্বর্গীয় মঃ ব্রিয়াণ্ড, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব সার আর্থার চেম্বার্লেন, ও ইতালির প্রধান মন্ত্রী সিনর মুসোলিনি লোকার্নোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি ফ্রান্সের আত্মরক্ষার দ্বিতীয় উপায়। কারণ ফ্রান্সকে যদি জার্ম্মানী আক্রমণ করে তাহা হইলে এই সন্ধি অনুসারে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালির সাহায্যের আশা করিতে পারে।

ফ্রান্সের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে "লিগ্ অফ নেশনের" সভ্য হইতে গররাজি হওয়ায় ফ্রান্স "লিগ্ কাউন্সিলের" বরাবর আমেরিকার সাহায্য পাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ফ্রান্স চেষ্টা করে যে, যদি লিগ্ কাউন্সিল কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহা হইলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অন্ততঃ নিজের নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া অপরাধী রাজশক্তির সহিত ব্যবসা করিবে না বা তাহাকে কোন প্রকার ঋণ দিবে না। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট কিন্তু তাহাতেও অসম্মত হয়; কারণ আমেরিকা "লিগ্ কাউন্সিলের" মত মান্য করিবে এই সর্ত্তে রাজি হইলে আমেরিকা "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য

না হইয়াও সভ্যের দায়িত্ব মাথায় লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনীতিবিশারদ স্বর্গীয় মঃ ব্রিয়াণ্ড এবং আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কেলগ এক নূতন প্রকারের সন্ধির দ্বারা বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে শান্তির আদর্শ প্রচারে বদ্ধ-পরিকর হন। এই সন্ধি "ব্রিয়াণ্ড কেলগ্ প্যাক্ট" (Briand-Kellog Pact) নামে পরিচিত। ইহার প্রধান মর্ম্ম এই যে, 'স্বাক্ষরকারী রাজশক্তিদের প্রধান লক্ষ্য শান্তি এবং বিনাযুদ্ধে বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করা।' এই সন্ধি "লিগ্ অফ্ নেশনের" সমস্ত সভ্যগণ স্বাক্ষর করে এবং রুষিয়া, আমেরিকা, ইজিপ্ট্—যাহারা "লিগ্ অফ নেশনের" সভ্য নয়, তাহারাও ইহাতে স্বাক্ষর করে। কাজেই বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আত্ম-রক্ষার জন্য ফ্রান্স "ব্রিয়াণ্ড-কেলগ প্যাক্টে"র উপর নির্ভর করে। এই প্যাক্টের স্বাক্ষরকারী রাজশক্তি যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহা হইলে ফ্রান্স এই আশা করে যে আমেরিকার সহানুভূতি ফ্রান্সের পক্ষে হইবে।

ফ্রান্সের একদল নেতা বিশ্বাস করেন যে "অ্যাঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ আঁতাত" যদি পুনরায় স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। ফ্রান্সের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এই "আঁতাতের" পুনরুদ্ভাবন সম্ভব নয়, কারণ ইংলণ্ডের শ্রমজীবিদলের ও লিবারেল পার্টির বহু নেতা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তারপর বর্ত্তমানে ফ্রান্স ইওরোপ মহাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজশক্তি; কাজেই

বহু ইংরাজরাজনীতিক্ ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত ন'ন। যদিও ইংরাজ বিশ্বরাজনীতি-বিশারদ নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, কিন্তু আসলে ফ্রান্সের শক্তি যাহাতে কম হয় তাহাই তাঁহারা চান। ফ্রান্সের রাজশক্তি খর্ব্ব করিবার বিষয়ে ইংলণ্ড, ইতালি ও জার্ম্মানীর নেতৃবৃন্দ অনেকটা একমত। কাজেই ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইলেও ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগ তাহাকে একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখে বলিয়া মনে হয়।

ফ্রান্স ইতালির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্যও বিশেষ উৎসুক; কিন্তু (১) আফ্রিকাতে ইতালি যাহাতে নূতন উপনিবেশের স্থান পায় অর্থাৎ ইতালির রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়, (২) ফ্রান্সের ও ইতালির নৌ-বাহিনী সমান শক্তিশালী হইতে পারে, এবং (৩) ফ্রান্সের আফ্রিকার উপনিবেশে ইতালির প্রজাদের বিশেষ অধিকার থাকিবে, এই তিন বিষয়ে ফ্রান্স ইতালির মতে সায় দিতে প্রস্তুত নয়। তাহা ছাড়া, ফ্রান্স যুগোশ্লাভিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, কাজেই যুগোশ্লাভিয়াকে সাহায্য করিতে বাধ্য এবং ইতালি যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত কারণে বর্ত্তমানে ইতালি জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। কাজেই ফ্রান্স ইতালির পররাষ্ট্র রাজনীতির পন্থা বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে।

বর্ত্তমানে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্স কেবল বেলজিয়ম, পোলাণ্ড, জেকোশ্লাভকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কাজেই ফ্রান্স পুনরায় রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সের সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্ররাজনীতির পন্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করা সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্ররাজনীতির প্রধান আদর্শ ছিল; কিন্তু জার্ম্মানীতে ন্যাশানেল সোস্যালিষ্ট (নাৎসি) বিপ্লবের পর হইতে সোভিয়েত রুষিয়া জার্ম্মানীর পররাষ্ট্ররাজনীতি পন্থাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিতেছে; কাজেই সোভিয়েত রুষিয়ার ইওরোপীয় পররাষ্ট্ররাজনীতিতে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সোজা কথায় সোভিয়েত রুষিয়া ফ্রান্সের সহিত ও ফ্রান্সের বন্ধুদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আমার বিশ্বাস যে ১৯৩৫ সালের মধ্যে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রুষিয়ার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইবে। *

ফ্রান্সের বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা এসিয়ার শক্তিশালী রাজশক্তিগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এসিয়ার রাজশক্তিদের মধ্যে ফ্রান্সের

* ১৯৩৩ সালে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। —প্রকাশক

আদর্শানুযায়ী তিনটী রাজশক্তি ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে—তুর্কি, পারস্য ও জাপান। ভারতবর্ষ, ইরাক ইত্যাদি আরবের দেশগুলি ও আফ্‌গানিস্থান্‌ ইংরাজের তাঁবে। শ্যামে বর্ত্তমানে বিপ্লব চলিতেছে এবং চীন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নয়। ফ্রান্সের বর্ত্তমানের নেতারা বিশেষতঃ ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ হেরিয়েট ও সেনেটর ফ্রাঙ্কলিন বুলিয়ন্‌ চাহেন যে ফ্রান্স ও তুর্কির মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তুর্কি ও সেভিয়েত রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে; এবং অতীতে মোস্তাফা কামাল পাশাকে ফ্রান্স বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ফ্রান্স ও সেভিয়েত রুষিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্ভাবনা; কাজেই অতি সহজে ফ্রান্স, সোভিয়েত রুষিয়া ও তুর্কির মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব হইতে পারে। এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ফ্রান্স ও পারস্যের মধ্যে শত্রুতার কোন কারণ নাই; কাজেই সময়ে ফ্রান্সের সহিত পারস্যের যাহাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার জন্য ফ্রান্স চেষ্টা করিবে একথা বলাই বাহুল্য।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯০৯ হইতে ফ্রান্সের সহিত জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঐ বন্ধুত্ব "ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের" পর আরও ঘনীভূত হয়। যেদিন ইংরাজ সিঙ্গাপুরে বিশাল নৌ-দুর্গ স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, জাপান ও ফ্রান্স সেইদিন হইতে ইংরাজের পররাষ্ট্রনীতি পন্থাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং তাহারা

জানে যে যদি কোনদিন ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয় এবং তাহারা যদি জাপানের সাহায্য না পায়, তাহা হইলে ইংলণ্ড তাহাদের এসিয়াস্থ উপনিবেশ ইন্দো-চায়না দখল করিবে। কাজেই বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে স্বার্থের তরফ হইতে ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও জার্ম্মানীর শক্তি খর্ব্ব করা। বহু প্রয়াসের ফলে বর্ত্তমানে ফ্রান্সের মিত্র হইতেছে বেলজিয়ম, পোলণ্ড, জেকোশ্লাভিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া। ফ্রান্সের সহিত জাপানের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ফ্রান্স সোভিয়েত রুষিয়া, তুর্কি ও পারস্যের সহিত বন্ধুত্ব বিস্তার করিতেছে। ফ্রান্স আশা করে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যাইবে না। শুধু ভয় এই যে হয়ত জার্ম্মানী, ইংরাজ ও ইতালির সাহায্য পাইবে এবং তাহার ফলে পুনরায় একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হইবে। কাজেই ফ্রান্সের নেতাদের এই চেষ্টা চলিয়াছে যে কোন উপায়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এবং ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যেন মনোমালিন্য না বাড়ে। ফ্রান্স চায় আত্মরক্ষা করিতে—যদি বিনাযুদ্ধে তাহা সম্ভব ভাল, আর বিনাযুদ্ধে যদি উহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে ফ্রান্স চায় অন্য রাজ-শক্তির সাহায্য। ফ্রান্সের নেতারা স্থিরভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আত্মশক্তি সকল

রাজশক্তির প্রধান অবলম্বন। ফ্রান্স ধনবল দ্বারা এবং অন্যান্য রাজশক্তির সাহায্যে শত্রুদমনের পন্থা খুঁজিতেছে। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে হঠাৎ কোন কর্ম্মপন্থার বা আদর্শের জয় হয় না—হয়ত পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টার ফলে একটা পন্থার জয় হয়। বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ফ্রান্সের কর্ম্মপন্থা এক পক্ষে আদর্শস্বরূপ। তবে ভবিষ্যতে ফ্রান্স আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কিনা, তাহা বলা অসম্ভব; কিন্তু একথা সত্য যে কোন একটী বিরুদ্ধ রাজশক্তি ফ্রান্সকে সহজে পরাজিত করিতে পারিবে না।

[বাইশ]

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর আদর্শ কি? ১৮৭১ সালে যখন প্রুসিয়া ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া জার্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করে, তখন হইতে তাহার প্রধান প্রচেষ্টা ফ্রান্স যেন পুনরায় বলশালী না হইয়া উঠে এবং অন্য কোন রাজশক্তির সাহায্যে জার্ম্মানীকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার সুযোগ না পায়। কাজেই বিস্‌মার্ক শান্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে জার্ম্মানীর আর্থিক ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। প্রথম তিনি জার্ম্মানীর বৃহৎ নৌ-বাহিনী স্থাপনের এবং উপনিবেশের (colonies) পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার আশঙ্কা ছিল জার্ম্মানী যদি বৃহৎ নৌ-বাহিনী গঠন করে এবং উপনিবেশ সংস্থাপন বিষয়ে ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তাহা হইলে ইংরাজ জার্ম্মানীকে শত্রুরূপে গণ্য করিতে পারে এবং তাহার ফলে ফ্রান্সের সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং যদি ফ্রান্স, রুষিয়া ও ইংরাজ একত্র হইয়া জার্ম্মানীর বিপক্ষে দাঁড়ায় তাহা হইলে জার্ম্মানীর জয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না বা পরাজয় নিশ্চিত। কাজেই যতদিন বিসমার্ক জার্ম্মান সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতির পরিচালন করিতেছিলেন ততদিন

তিনি রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এবং ইংরাজের সহিত সৌহৃদ্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

যখন জার্ম্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম বিসমার্ককে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করেন তখন হইতে জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তিত হয়। জার্ম্মানী যাহাতে তুনিয়ার মধ্যে এক মহাশক্তিশালী রাজশক্তি বলিয়া গণ্য হয় তাহার জন্য বিশাল নৌ-বাহিনী গঠিত হইতে থাকে এবং এশিয়া ও আফ্রিকাতে জার্ম্মানীর প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রয়াস আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিশ্বরাজ-নীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর পন্থা সম্পূর্ণ ভুল হওয়াতেই জার্ম্মানী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হয়। যদি জার্ম্মানী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত তাহা হইলে জার্ম্মানীর প্রতিপত্তি একদিকে বেলজিয়মের উপকূল হইতে পারস্য উপসাগরের কূল পর্য্যন্ত এবং অপরদিকে রুষিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বলকান্ উপদ্বীপে, এমন কি কাস্‌পিয়ান হ্রদের কিনারা পর্য্যন্ত পৌঁছিত। এই কল্পনা যে জার্ম্মানীর সামরিক নেতাদের মধ্যে ও অনেক বিশ্বরাজনীতিবিশারদদের মধ্যে ছিল তাহাতে ভুল নাই।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেই জার্ম্মানীর শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং তাহার শক্তিবৃদ্ধির পথে নানা প্রকারের অন্তরায় দেখা দেয়; বর্ত্তমান যুগের গত পনর বৎসর ধরিয়া জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

নেতাদের দ্বারা চালিত হইলেও তাহাদের প্রকৃত আদর্শ ছিল এক।

জার্ম্মানীর লুপ্তশক্তি ও সত্ব পুনরুদ্ধার করিয়া নষ্ট গৌরবকে আবার বাড়াইতে হইবে। কাজেই জার্ম্মানীর সকল রাজনৈতিকদলই ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে ছিল। জার্ম্মানীর জাতীয়তাবাদী নেতারা অনেক সময় ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যান ও ডাক্তার ক্রুনিংর পন্থার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অন্যায় অভিযোগ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা জার্ম্মানীর মুক্তির জন্য এবং আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিশেষভাবে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যান্ যদি জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রবিভাগের পরিচালনার ভার না লইতেন তাহা হইলে ১৯৩০ সালে ফ্রান্স কখনও তাহার সৈন্য জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ড হইতে সরাইত না। ডাক্তার ক্রুনিং যদি জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রপন্থার পরিচালনার দায়িত্ব না লইতেন, তাহা হইলে জার্ম্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত এমন হইত না যে জার্ম্মানীকে আর কোন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা ধার দিতে হইবে না। অনেকে জার্ম্মানীর ডেমোক্রাট্, সোস্যালিষ্ট ও ক্যাথলিক্ নেতাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া অবজ্ঞা করে। ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কথা সত্য যে যুদ্ধের পরাজয়ের পর জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্ট, ডেমোক্রাট ও ক্যাথলিক নেতারা

জার্ম্মানীকে তাহার শোচনীয় অবস্থা হইতে উঠাইবার জন্য ভারগ্রহণ করেন এবং তাহার যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মান ন্যাশানালিষ্ট ও জার্ম্মান ন্যাশানাল সোস্যালিষ্টরাই চক্রান্ত করিয়া আজ জার্ম্মানীর শাসকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শেষ হয় তখন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর অবস্থা অতি অবনত ছিল। কাজেই যে কোন উপায়ে যাহাতে জার্ম্মানী "জাতে" উঠিতে পারে তাহার জন্য জার্ম্মান নেতাদের চেষ্টার ক্রুটী ছিল না। প্রথমে জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্ট ও ডেমক্রেট নেতারা এই চেষ্টা করেন যে জার্ম্মানী যাহাতে "লিগ্ অফ নেশনের" সভ্য হইতে পারে। অনেক চেষ্টার পরও যখন জার্ম্মানীকে "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্য হইতে দেওয়া হইল না, তখন জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র সচিব ডাক্তার রাথনাউ এই স্থির করেন যে, যে-কোন উপায়ে জার্ম্মানীকে "এক ঘরে" অবস্থা হইতে উঠিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্বের সন্ধি করেন। ঐ সন্ধিই রাপালোর সন্ধি। ডাক্তার রাথনাউ ও সেভিয়েত রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব চিচিরিন তাহা রাপালো গ্রামে স্বাক্ষর করেন।

রাপালো সন্ধির মূলে ছিল বিসমার্কের পুরাতন উপদেশ—জার্ম্মানী ও রুষিয়া যদি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে ফ্রান্স সহজে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

রুষিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব থাকিলে পোলাণ্ড ও ফ্রান্স অতি সহজে জার্ম্মানী ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিবে না। রাথনাউ ছিলেন ডেমক্রাট্ ও ইহুদী ; কাজেই জার্ম্মান ন্যাশানলিষ্ট ও তাহাদের গুপ্ত "টেররিষ্টরা" (Terrorist) তাহাকে খুন করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে তাহারা এই উপায়ে সোস্যালিষ্ট, ডেমক্রাট ও ক্যাথলিক পার্টির শক্তি নাশ করিতে পারিবে। আসল কথা, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-নীতি-ক্ষেত্রে প্রথম পন্থা ছিল রুষ-জার্ম্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব সংস্থাপন।

রাথনাউর মৃত্যুর পর অল্প সময়ের জন্য জার্ম্মানীর কোন কোন নেতা, বিশেষতঃ যাঁহারা ন্যাস্নালিষ্ট দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এই স্থির করেন যে যদি কোন উপায়ে ইংরাজের সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে জার্ম্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। এই মতাবলম্বী জার্ম্মান নেতাদের ধারণা ছিল যে জার্ম্মানী যদি ভার্সাই সন্ধি পূরণ না করে এবং ফ্রান্স যদি জার্ম্মানীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলেই ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যাইবে এবং জার্ম্মানীকে সাহায্য করিবে। এই ভুল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই জার্ম্মানী ফ্রান্সকে চুক্তি মত কয়লা ও কাঠ দিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহার ফলে ফ্রান্স রুঢ় প্রদেশ অধিকার করে। এই সময় ইংরাজ কোনরূপে জার্ম্মানীকে সাহায্য করে নাই। এই

ঘটনার পর ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যান স্থির করেন, এক দিকে জার্ম্মানী রুষিয়ার সহিত সদ্ভাব রাখিবে ও অপর দিকে জার্ম্মানী যাহাতে ফ্রান্সের সহিত সদ্ভাব করিয়া, তাহার সাহায্যেই ভার্সাই সন্ধির পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যান বুঝিয়াছিলেন যে ফ্রান্স ও ইংরাজে বিবাদ বাধাইয়া জার্ম্মানী নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে না। ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যানের চেষ্টায় এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রিয়াণ্ডের সহযোগিতায়, জার্ম্মানী "লিগ অফ নেশনের" কাউন্সিলের সভ্য হইতে পারে এবং লোকারণো প্যাক্টে স্বাক্ষর করিয়া জার্ম্মানীর শান্তিপ্রিয়তা-মূলক পররাষ্ট্রনীতি পন্থার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। ফ্রান্স যে জার্ম্মান-প্রেমে মত্ত হইয়াছিল তাহা নহে—ফ্রান্সের নেতারা বিশেষতঃ ব্রিয়াণ্ড বুঝিয়াছিলেন যে, যতদিন ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে বিবাদ চলিবে ততদিন ইউরোপে কোনও রূপ শান্তির সম্ভাবনা নাই। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যদি প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তাহা হইলেই যথা সময়ে ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার এবং সমস্ত ইওরোপের মঙ্গল হইবে; সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইবে। ষ্ট্রেসম্যানও ফ্রান্স বা রুষ-প্রেমে মত্ত হন নাই; তিনি জানিতেন, জার্ম্মানীর শক্তি কতটা ছিল। তার পর যদি ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও রুষিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব হয় তাহার ফলে

পররাষ্ট্র রাজনীতিক্ষেত্রে জার্ম্মানীর শক্তি বাড়িবে উপরন্তু শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও বলশালী হইয়া উঠিবে এবং যথা সময়ে ফ্রান্স ও রুষিয়ার সম্মতিক্রমে ও সাহায্যে পোলাণ্ডের নিকট হইতে লুপ্ত রাজ্য ফিরিয়া পাইবে—এমন কি জার্ম্মানী আফ্রিকার উপনিবেশও ফেরত পাইতে পারে। যাঁহারা ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যানের পররাষ্ট্রনীতি বুঝিতে চান, তাঁহারা ন্যাশনালিষ্ট বা ন্যাশানাল সোস্যালিষ্টদের বক্তৃতার উপর নির্ভর না করিয়া ষ্ট্রেসম্যানের জীবনী পড়িবেন। ষ্ট্রেস-ম্যানের রাজনীতিপন্থার ফলে ফ্রান্স যদিও ভার্সাই সন্ধি অনুসারে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য রাখিতে পারিত তথাপি ১৯৩০ সালেই নিজ সৈন্য জার্ম্মানী হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। ডাক্তার ষ্ট্রেসম্যানের মৃত্যুর পর ডাক্তার ব্রুনিং তাঁহার পন্থায় চলিতে থাকেন এবং যাহাতে ফ্রান্সের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেজন্য বিশেষ প্রয়াস পান। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে যদি ষ্ট্রেসম্যানের পররাষ্ট্ররাজনীতির ফলে ১৯৩০ সালে ফ্রান্স রাইনল্যাণ্ড হইতে সৈন্য না সরাইত, তাহা হইলে আজ হিট্‌লারপ্রমুখ জার্ম্মান-নেতারা এত আস্ফালন করিতে পারিত না।

জার্ম্মানীতে ন্যাশানাল্ সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের পর হইতে জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিট্‌লার ও তাঁহার পরামর্শদাতাদের পররাষ্ট্র রাজনীতিপন্থা এই—

ফ্রান্স জার্ম্মানীর বর্ত্তমানের মহাশত্রু; তারপর সোভিয়েত রুষিয়া জার্ম্মানীর শত্রু (জার্ম্মানীর ন্যাসানাল সোস্যালিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে, কাজেই কম্যুনিষ্ট রুষিয়া ন্যাশানাল সোস্যালিষ্ট জার্ম্মানীর শত্রু)। প্রথমে ফ্রান্সের দমনের জন্য জার্ম্মানী যে-কোন উপায়ে ইংলণ্ড ও ইতালির সাহায্য লইবার জন্য চেষ্টা করিবে। এই পন্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হিট্‌লারের গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ইংরাজের বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারে সেই চেষ্টা করিতেছে। হিট্‌লারের মন্ত্রীবর্গের ধারণা যে ইতালি ইংরাজের বিরুদ্ধে যাইবে না; এবং যদি ইংরেজের পররাষ্ট্রপন্থা জার্ম্মান বিরোধী হয় তাহা হইলে ইতালি জার্ম্মানীকে সাহায্য করিয়া ইংরাজের অপ্রিয় হইবে না। কাজেই ইংরাজের বিশ্বাসভাজন হইবার জন্যই হিট্‌লার ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখনী চালাইয়াছে এবং বক্তৃতা দিয়াছে; শুধু তাই নয়, হিট্‌লার বলে যে বর্ত্তমানে জার্ম্মানী হঠাৎ নৌ-বাহিনী গঠনের বা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসী নহে। হিট্‌লারের সহকারীরা বিশেষতঃ ডাক্তার রোজেনবর্গ ও ডাক্তার হুগেনবর্গ (ন্যাশানালিষ্ট নেতা) খোলাখুলিভাবে বলে যে জার্ম্মানী যাহাতে পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান নেতৃবর্গ মনে করেন, ইংলণ্ড রুষিয়ার বিরুদ্ধে, কাজেই জার্ম্মানী যদি রুষিয়ার বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে প্রকাশ্যভাবে না হইলেও

অন্ততঃ গোপনে সহায়তা করিবে। ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে নানা কারণে বিশেষ সদ্ভাব নাই কাজেই জার্ম্মানীর বর্ত্তমান নেতারা খোলাখুলিভাবে বলেন যে তাঁহাদের আদর্শ—ইংলণ্ড, জার্ম্মানী ও ইতালির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপন এবং উহার ফলে ফ্রান্সের শক্তিক্ষয় এবং জার্ম্মানীর পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার।

এই পন্থার ফলে ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বলা যায় না; তবে একথা সত্য যে জার্ম্মানী-রুষিয়ার বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ফ্রান্স-রুষিয়ার বন্ধুত্বের নূতন সূত্রপাত হইয়াছে। আজ যদিও ইতালি অনেক বিষয়ে জার্ম্মানীর পক্ষ লইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে কিন্তু জার্ম্মানী যদি অষ্ট্রিয়া ও বলকান প্রদেশে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে হয়ত ইতালি ও জার্ম্মানীর মধ্যে বন্ধুত্বের হ্রাস হইবে।

একথা সত্য যে আজ ইংলণ্ডের একদল রাজনীতিক্ ফ্রান্সের বিরুদ্ধবাদী; কিন্তু যদি কোন দিন জার্ম্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করে এবং ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সের রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করে, তখন ইংরাজ যে জার্ম্মানীর পক্ষ লইতে প্রস্তুত হইবে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমে নাই। কাজেই প্রায় সাতকোটী জার্ম্মান শ্রমিক ইংরাজের চক্ষে চার কোটী ফরাসীদের অপেক্ষা অধিক আশঙ্কার কারণ।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী পররাষ্ট্র নীতিক্ষেত্রে প্রায় "একঘরে" হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মান ন্যাশনাল্ সোস্যালিষ্টরা যদিও ইহুদি ও অন্য জাতিদিগকে (এসিয়াবাসীদের) নিজেদের অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, তথাপি তাহারা আশা করে যে জাপান ও জার্ম্মানীর মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে সহজে রুষিয়ার শক্তি খর্ব্ব হইবে। জাপান জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে চাহে কিন্তু যতদিন জার্ম্মানীর পররাষ্ট্ররাজনীতি ইংরাজের সাহায্যের উপর নির্ভর করিবে ততদিন জার্ম্মানী ও জাপানের প্রকৃত বন্ধুত্ব সম্ভব হইবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে জাপান, জার্ম্মান ও ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব রুষিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভবপর ছিল (তখন জার্ম্মানী রুষিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজের সাহায্যে যাইতে প্রস্তুত হয় নাই)। বর্ত্তমানে জাপান ও ফ্রান্সের সম্পর্ক গাঢ়তর হইয়াছে। সুতরাং জার্ম্মানী যে হঠাৎ জাপানের প্রকৃত বন্ধুত্ব পাইবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফ্রান্সের শক্তি নাশ করিয়া এবং জার্ম্মানীর শক্তি বাড়াইয়া জাপানের কোন লাভ নাই।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী চায় চীনে বাণিজ্যবিস্তার। জার্ম্মানী পারস্য ও তুর্কির সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রয়াসী; এ বিষয়ে বর্ত্তমানে আশা বিশেষ কম। অথচ জার্ম্মানী তাহার লুপ্ত রাজ্য ও শক্তি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অন্য রাজশক্তির সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে; এবং যদি এই সাহায্য পায় তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করিয়া লুপ্তরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হিট্‌লার প্রথমে পোলাণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে পোলাণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়ার বন্ধুত্ব ছাড়িয়া জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুত্ব করে, তজ্জন্য পোলাণ্ডকে নানা প্রকার লাভের আশা দেখাইতেছে। এরূপ গুজব শুনা যায়, যদি পোলাণ্ড জার্ম্মনীর সহিত বন্ধুত্ব করে এবং জার্ম্মনীকে "পোলিস করিডর" (পূর্ব্ব প্রুসিয়ার একাংশ যাহা এখন পোলাণ্ডের অধীনে) ও ডানজিগ দখল করিতে দেয় তাহা হইলে পোলাণ্ড যদি উক্রেনিয়া (সোভিয়েত রুষিয়ার অংশ) দখল করিতে চায় তাহাতে জার্ম্মানী সাহায্য করিবে। আমার বিশ্বাস যে পোলাণ্ড জার্ম্মানীকে বিশ্বাস করিয়া ফ্রান্স ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে না।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র রাজনীতির অবস্থা যে ভাল নয় সে সম্বন্ধে কোন ভুল নাই। অনেকে বলিবেন যে জার্ম্মানী কোন রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে চায় না! হিটলারের বক্তৃতায় তাহা দেখা যায় তাহা সত্য, এবং বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর নেতারাও "শান্তি পন্থা" প্রচার করিতেছেন; কিন্তু একথাও সত্য যে জার্ম্মানীর লুপ্তগৌরব ও হৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য তাহাকে একদিন যুদ্ধ করিতে হইবে—এই আদর্শটা তাঁহারা কার্য্যতঃ অনুসরণ করিতেছেন। যদিও জার্ম্মানীকে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে মাত্র একলক্ষ সৈন্য রাখিবার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু আজ জার্ম্মানীতে অন্ততঃ তিন লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য

আছে এবং প্রয়োজন হইলে কয়েক মাসের মধ্যে জার্ম্মানী বিশ লক্ষ বা ততোধিক সৈন্য একত্র করিতে পারিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। জার্ম্মানী সামরিক শক্তিতে ফ্রান্সের সমান শক্তিশালী হইতে চায়। জেনিভার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে (Disarmament Conference) জার্ম্মানী এই অধিকার পূর্ণভাবে পাইবে না জানিয়া, নিজের জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য এবং নিজে সময়মত সকল প্রকারের অস্ত্র সংগ্রহ করিবার অধিকার পাইবার জন্য "লিগ্ অফ্ নেশনের" সভ্যপদ ত্যাগ করে।

জার্ম্মানী বর্ত্তমানে ফ্রান্সের সহিত আলোচনা করিতেছে যে দশ বৎসরের জন্য জার্ম্মানী একটা নূতন সন্ধি করিবে যে ফ্রান্সের ও জার্ম্মানীর মধ্যে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন যুদ্ধ হইবে না। ফ্রান্স এরূপ সন্ধি করিতে রাজী হইঁবে না। ফ্রান্স বলিবে যে শান্তিরক্ষা যদি জার্ম্মানীর আদর্শ হয় তাহা হইলে জার্ম্মানী লোকার্নো সন্ধি মানিয়া চলিলেই ফ্রান্স সন্তুষ্ট হইবে। ভার্সাই সন্ধি অনুসারে যদিও জার্ম্মানীকে সমরোপযোগী বিমানপোত রাখিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, তথাপি জার্ম্মানীতে সহস্র সহস্র বিমানপোত তৈয়ার করা হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বিমানপোত পরিচালককে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অনেকের বিশ্বাস যে এই সমস্ত বিমানপোত অল্প প্রয়াসে সামরিক বিমানপোতে পরিণত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী একলা ফ্রান্স

ও তাহার সহযোগিদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না। কাজেই জার্ম্মানী চায় শান্তি; কিন্তু যদি জার্ম্মানী দশ বৎসর সময় পায় এবং ঐ সময় অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার ও প্রয়োজনীয় কার্য্যে লাগাইতে পারে এবং সে সময়ের মধ্যে ইংরাজ ও ইতালির সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে তাহা হইতে হয়ত জার্ম্মানী যুদ্ধে জয়ী হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জার্ম্মান নেতারা ভবিষ্যতের কার্য্যপন্থা স্থির করিতেছে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই পন্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

[তেইশ]

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ইতালির পররাষ্ট্র রাজনীতি কি? কোন রাজশক্তির বা জাতির পররাষ্ট্র পন্থা জানিতে হইলে তাহার জাতীয় ইতিহাস জানা দরকার। ইতালি বর্ত্তমানে নব জাগ্রত। অতীতে ইতালী ইউরোপের অধিকাংশ এমন কি ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; ইতালির প্রতাপ যে একদিন উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে বিরাজিত ছিল, এই তথ্য আজ ইতালিকে উত্তেজিত করিতেছে। একথা সত্য যে প্রায় ৩০০ বৎসর ইতালির ইতিহাস খুব আশাপ্রদ ছিল না; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালির স্বাধীনতা প্রয়াসের সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ইতালির জাতীয় উন্নতি ক্রমশঃ

আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা বলিয়া লই যে ইতালি ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় হইতে, বার্লিনের কংগ্রেসের সময়, বক্সার যুদ্ধের সময়, য়্যান্জাসেরিস্ কন্ফারেন্স ও বলকান্ যুদ্ধের সময় ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সময় সর্ব্বতোভাবে নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। ইতালির বর্ত্তমান উন্নতি হঠাৎ হয় নাই, স্তরে স্তরে হইয়াছে।

ইতালির বর্ত্তমান পররাষ্ট্র পন্থা বুঝিতে হইলে **প্রথমতঃ** বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সময় ইতালির লক্ষ্য কি ছিল তাহা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, কিন্তু এখন আরও কিছু বলিতে চাই। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইতালির তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:—(১) দক্ষিণ অস্ট্রিয়াতে যে প্রদেশে ইতালিয়ান্ বাসিন্দা অধিক ছিল এবং যে প্রদেশ এক সময়ে ইতালির অধীনে ছিল, তাহা পুনরধিকার করা। (২) য়্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের পূর্ব্ব দিকে ইতালির শক্তি বৃদ্ধি করা এবং ভূমধ্যসাগরে ইতালির প্রতিপত্তি বিস্তার করা এবং (৩) আফ্রিকাতে ও এশিয়া মাইনরে ইতালিয় উপনিবেশ স্থাপন করা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালি নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে। যখন ইতালি অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয় তখন ইংরাজের বিশ্বরাজনীতি পন্থা—অস্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর পক্ষে ছিল এবং ঐ সময় ইংরাজ ফ্রান্স ও

রুষিয়ার বিরুদ্ধপন্থী ছিল। ইতালির স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতালীর পররাষ্ট্র রাজনীতির প্রধান নীতি হইতেছে যে ইতালি কখন ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। এই পন্থার প্রধান কারণ এই যে ইতালি যদি ইংরাজের শত্রু হয় তাহা হইলে তাহার বহির্বাণিজ্য সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা; আর ইতালি যদি ইংরাজের পররাষ্ট্র পন্থার বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইংরাজের সাহায্যে তাহার উন্নতির পন্থা সহজ হইবে। আফ্রিকা, এসিয়া মাইনর ও বলকান প্রদেশে ইতালির প্রতিপত্তি বিস্তার পন্থা, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাজশক্তির মনঃপূত নহে। কিন্তু এবিষয়ে ইংরাজের বিশেষ আপত্তি নাই বরঞ্চ তাহারা ইতালির পক্ষাবলম্বন করে; কাজেই বর্ত্তমানে ইতালির পররাষ্ট্র পন্থার মূলমন্ত্র হইল ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব। ইতালি যদি ভূমধ্যসাগরে প্রতি-পত্তিশালী হয় তাহা হইলে তাহার ফ্রান্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িবে; তাহাতে ইংরাজের লাভ ব্যতীত লোকসান নাই; কাজেই ইংরাজের পক্ষে ইতালির প্রতাপ বৃদ্ধি ও ইতালি-ইংরাজ বন্ধুত্ব অপ্রীতিকর নহে।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পূর্ব্বে বলকান্ প্রদেশে অস্ট্রিয়ার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু ঐ যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পতনের পর ইতালি অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ টিরোল অধিকার করিয়া আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমানে ইতালি বলকানে তাহার প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিতে চায়। অস্ট্রিয়ার

পতনের সঙ্গে সঙ্গে জেকোশ্লাভোকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার বিশেষ শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং এই তিন রাজশক্তিকে সাধারণতঃ Little *entente* বলা হয়। এই তিন রাজশক্তি ফ্রান্সের বন্ধু এবং উহারা পররাষ্ট্র নীতিক্ষেত্রে একই পন্থা অনুসরণ করে; কাজেই এই তিন রাজশক্তি বলকানে ইতালির শক্তি বিস্তারের বিরোধী। ইতালির নায়ক সিন্ঞর মুসোলিনি তাই স্থির করেন যে হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও অস্ট্রিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া এই তিন শক্তির দ্বারা Little *entente* এর প্রতাপ খর্ব্ব করিয়া ইতালির প্রতিপত্তি বাড়াইবেন। শুধু তাহাই নয়, ইতালি যদি তুর্কি ও গ্রীসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এই দুই রাজ-শক্তির মধ্যে ইতালির প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে তাহা হইলে ইতালির পক্ষে তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে।

ইতালি বর্ত্তমানে আলবেনিয়াকে প্রকৃত পক্ষে নিজের অধীনে আনিয়াছে। যাহাতে জার্ম্মানী অস্ট্রিয়ায় নিজ প্রতিপত্তি স্থাপন না করিতে পারে তাহার জন্য মুসোলিনি, অস্ট্রিয়ার নেতা ডলফুসকে হিট্‌লারের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেন এবং বর্ত্তমানে প্রিন্স ষ্টারহুমবুর্গকে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে অস্ট্রিয়ায় নাৎসি প্রতিপত্তি ও ফ্যাসিষ্ট প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।

একদিকে ইতালি বলকানে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রুষিয়ার সহিত

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইতালির ফ্যাসিজম্ ও রুষিয়ার কমিউনিজম্ পরস্পরের শত্রু কিন্তু বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ইতালি সোভিয়েত রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছুক; কারণ তাহা হইলে ইতালি রুষিয়া হইতে অনেক মালমসলা ক্রয় করিতে পারিবে।

ইতালির রুষিয়ার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টার আর একটা কারণ এই যে রুষিয়া ও তুর্কি পরস্পরের বন্ধু এবং যদি রুষিয়া ও তুর্কি ইতালির বন্ধু হয় তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরে, বলকান প্রদেশে এবং এসিয়া মাইনরে ইতালির শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সুযোগ হইবে। কাজেই ইতালি সম্প্রতি রুষিয়ার সহিত নূতন সন্ধি করিয়াছে যে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাব সংরক্ষণ করিবে এবং এক শক্তি অপর শক্তির শত্রুকে সাহায্য করিবে না। এই সন্ধির প্রধান অর্থ এই যে যদি কোন দিন ইতালির সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে তখন রুষিয়া যেন ফ্রান্সের সহায় না হয়; রুষিয়ার উদ্দেশ্য যে যদি কোন দিন জার্ম্মানী ও রুষিয়ার মধ্যে বা রুষিয়া ও ইংরাজের মধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ হয় তখন ইতালি রুষিয়ার বিরুদ্ধে যাইবে না।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানী ও ইতালির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কিন্তু যেদিন জার্ম্মানী অস্ট্রিয়াকে নিজের অঙ্গীভূত করিবে সেদিন হইতে ইতালি ও জার্ম্মানীর বন্ধুত্ব থাকিবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়; কারণ জার্ম্মানী অস্ট্রিয়ায় নিজের আধিপত্য

বিস্তার করিতে পারিলে বলকানেও নিজের প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং উহা ইতালির পক্ষে বিশেষ প্রীতিজনক হইবে না। বর্ত্তমানে ইতালি ও জার্ম্মানী উভয়েই ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, কাজেই ইতালি, জার্ম্মানীর পক্ষে; কিন্তু যেদিন ইতালি ও জার্ম্মানীর মধ্যে বল্‌কান্ প্রদেশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিবে সেদিন হইতেই হয়ত ইতালি ফ্রান্সের এবং বিশেষতঃ রুষিয়ার মিত্রতা প্রার্থী হইবে।

যদি কোন রাজশক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থা, আর্থিক-শক্তি, শিল্প বাণিজ্য শক্তি, সামরিক শক্তি ও জাতীয় একতা ইত্যাদি খুব উৎকৃষ্ট ধরণের না হয় তাহা হইলে সে পররাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে বিশেষ মর্য্যাদা পায় না।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব ভাল ছিল না বলিয়া ভার্সাই সন্ধির সময় আফ্রিকাতে বা এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার পায় নাই। ইতালির বর্ত্তমান নেতা এবং ফ্যাসিজমের প্রাণ সিন্যর মুসোলিনি ইতালির জাতীয় সম্মান ও মর্য্যাদা আন্তর্জাতিক জগতে বাড়াইবার জন্য, ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি এবং জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। গত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ইতালির সামরিক শক্তি, নৌশক্তি, সামরিক বিমান শক্তি, আর্থিক বল, বাণিজ্যপোত বল, ব্যবসা বাণিজ্য ও জাতীয় শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

সিন্যর মুসোলিনির নেতৃত্বের ফলে ইতালির মধ্যে জাতীয় একতা চূড়ান্ত অবস্থায় আসিয়াছে। ইতালির জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে নূতন দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। জাতীয় উন্নতির জন্য, জাতীয় কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কর্ম্মযোগীর মত সাধনার আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। এই আদর্শ আজ ইতালির শক্তিবৃদ্ধির মূলে।

ইতালি আজ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলেও অন্ধের মত এই দুই রাজশক্তির পদাঙ্কানুসরণ করিতে প্রস্তুত নয়। ইতালির নেতারা বিশেষতঃ সিন্যর মুসোলিনি বুঝেন যে ইতালি প্রাচ্যের বিভিন্ন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিলে আর্থিক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে এমন কি বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ লাভবান হইবে; কাজেই আজ রোমে প্রাচ্য যুবকদের শিক্ষার সুবিধার জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে। সম্প্রতি সিন্যর মুসোলিনি ইওরোপের প্রাচ্য ছাত্রবৃন্দের প্রথম কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইতালি প্রাচ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নাই।

ইতালি বর্ত্তমানে কোন প্রবল রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চায় না; কারণ কয়েক বৎসর শান্তিতে থাকিতে পারিলে ঐ সময়ে ইতালির আর্থিক, সামরিক, নৌশক্তি ও বিমানপোত শক্তি আরও বাড়িবে। কিন্তু যদি ইতালির জাতীয় শক্তি ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধে নামিতে বাধ্য

হয় তাহা হইলে ইতালি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ইতালি কাহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। যে পক্ষ অবলম্বন করিলে ইতালির বিশেষ লাভ হইবে, সেই পক্ষের হইয়া ইতালি যুদ্ধে নামিবে। ইওরোপের বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ইতালির শক্তি ও মর্য্যাদা যে কত বাড়িয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়—আজ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্রসচিব সিন্যর মুসোলিনির সহিত বিনা পরামর্শে একটা কোন বিশেষ আন্তর্জাতিক পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নয়। ফ্রান্সের বিশ্বরাজনীতি-বিশারদেরাও ইতালির সহিত বন্ধুত্ব করিতে অনিচ্ছুক নহেন। ইতালির নেতারা দেখাইয়াছেন যে যদি কোন রাজশক্তি বা প্রজাশক্তি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা।

[চব্বিশ]

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজ রাজশক্তির পররাষ্ট্র পন্থা কি? ইংরাজের পররাষ্ট্র পন্থার সম্বন্ধে বিচার করিবার অর্থ জগতের সকল প্রধান রাজশক্তির সহিত ইংরাজের সম্পর্কের বিচার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতের প্রায় ⅕ অংশ ব্যাপিয়া আছে, কাজেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইংরাজের স্বার্থের সহিত অপর রাজশক্তির বা প্রজাশক্তির স্বার্থের সম্পর্ক আছে। বর্ত্তমানে ইংরাজের প্রধান আদর্শ এই যে তাহাদের বিশ্বব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য যাহাতে অটুট থাকে; তাহাদের আর্থিক বল, ব্যবসা বল, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ছোট ছোট বিষয়ে এবং অনেক সময়ে বড় বড় বিষয়ে ইংরাজ নেতারা অন্য রাজশক্তির প্রতি বদান্যতার ভাব দেখাইতে পারে; কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে কোন রাজশক্তি তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাহাদের প্রতিপত্তি নাশের জন্য প্রয়াসী, তখনই তাহারা সর্ব্বপ্রকারে,—আত্মশক্তির দ্বারা এবং অন্য রাজশক্তির সাহায্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পতনের জন্য যত্নবান হয়।

বর্ত্তমান যুগে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংরাজের পররাষ্ট্রীয় পন্থার সম্বন্ধে আলোচনা

করিলে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়ঃ—(১) বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মানীর সর্ব্ববিষয়ে পতন হয়; তাহার নৌ-বাহিনী, উপনিবেশ ও বাণিজ্য শক্তি নাশ হয়; কাজেই ইংরাজ জার্ম্মানীর প্রতি সদয় ভাব দেখাইতে সক্ষম হয়; অর্থাৎ ইংরাজ অন্ততঃ গত ১৫ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানীকে বিশেষ শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে নাই। (২) বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে যদিও রুষিয়ার পতন হয় তথাপি ইংরাজ নেতারা রুষিয়ার সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের পন্থাকে ইংরাজ বিদ্বেষী বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাও খুব ভালভাবে জানিতেন যে যদিও সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট, চীন, আফগানিস্থান, পারস্য, তুর্কি এমন কি ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে তথাপি সোভিয়েত রুষিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইবে না। কাজেই ইংরাজ সোভিয়েত রুষিয়ার বিরুদ্ধে হইলেও, সোভিয়েত রুষিয়াকে মারাত্মক শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে নাই।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে ইংরাজের তিনটী প্রকৃত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায়,—এসিয়ায় জাপান, আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপে ফ্রান্স। ইংরাজ বিশ্বরাজনীতিবিশারদেরা খুব ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোক এবং কখন একসময়ে দুই তিনটা রাজশক্তির সহিত ঝগড়া করিতে চান না। ইংরাজের যদি একাধিক শত্রু থাকে তাহা হইলে তাহার শত্রুরা যাহাতে

একত্র হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারে, এই পন্থা অবলম্বন করেন। এই পন্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড নীতি প্রয়োগ করেন। তাহার পর তাঁহারা স্থির করে, যে কোন্ রাজশক্তি প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের ভীষণ শত্রু। একবার যখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন্ রাজশক্তি ইংরাজের প্রকৃত শত্রু এবং তাহার দমন না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা তখনই ইংরাজ নেতারা তাহার দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজ, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত বর্ত্তমানে বিবাদ করিতে প্রস্তুত নয়, বরং আমেরিকার সাহায্যে নিজের শক্তিবৃদ্ধি ও শত্রুদমন করিতে চায়। কাজেই বর্ত্তমানে ইংরাজের দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে— ইওরোপে ফ্রান্স এবং এসিয়ায় জাপান। ফ্রান্স চায় যে ইংরাজ ও ফ্রান্স একত্র হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবে; কাজেই ফ্রান্স ইংরাজের অনিষ্ট করিতে বা ইংরাজের সহিত কলহ করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন ফ্রান্স দেখে যে ইংরাজ নেতারা জার্ম্মানীর প্রতি উদারতা দেখায় এবং ইতালির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে উৎসুক, তখন ফ্রান্স তাহাদের পররাষ্ট্রীয় পন্থার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। অপর দিকে ইংরাজ দেখে যে ফ্রান্স নিজের সামরিক শক্তি, নৌ-বাহিনী ও বায়ুযান বাড়াইতেছে এবং বেলজিয়ম, পোলাণ্ড, জেকো-শ্লাভোকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এমন কি রুষিয়া

ও জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন ইংরাজও ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়াই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। তবে একথা সত্য যে ফ্রান্স ও ইংরাজের মধ্যে কলহের বিশেষ কোন কারণ নাই ; ইংলণ্ডের অনেক রক্ষণশীল দলের নেতারা এবং ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ফ্রান্স ও ইংরাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি কোনদিন ইংরাজ ও ফ্রান্সে কোন যুদ্ধ হয় তবে তাহা ইংরাজ ফ্রান্সকে আক্রমণ করার দরুণ বা ফ্রান্স ইংলণ্ডকে আক্রমণ করার দরুণ হইবে না। হয়ত কোন কারণে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে অথবা কোন কারণে ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে, তখন ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে নামিতে হইবে।

ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ হইলে বা ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ হইলে ইংরাজের "মাথা ব্যথা" হইবে কেন ?

ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর যুদ্ধে যদি ফ্রান্স তাহার বন্ধুদের সাহায্যে জার্ম্মানীকে পরাজিত করে এবং ফ্রান্স ইওরোপে আরও বলশালী হইয়া উঠে—তাহা হইলে ইংরাজের ভবিষ্যৎ ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা ; কাজেই ইংরাজ আত্মরক্ষার জন্য জার্ম্মানীকে সম্পূর্ণ নাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। অপর দিকে জার্ম্মানী যদি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জার্ম্মানী ফ্রান্সের উত্তর প্রদেশ অধিকার

করে, তাহা হইলে ইংরাজ ফ্রান্সের রক্ষার জন্য জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইবে। এইসঙ্গে পুনরায় বলি যে "লোকার্নোর" সন্ধি অনুসারে যদি কোনদিন ফ্রাঙ্কো জার্ম্মান যুদ্ধ হইলে তাহাতে যে পক্ষ প্রথম ফ্রান্স আক্রমণ করিবে ইংরাজ ও ইতালি তাহার বিরুদ্ধে যাইতে বাধ্য। তার পর যদি ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ফ্রান্স ইতালিকে পরাজয় করিয়া ভূমধ্যসাগরে বিশাল বলশালী হয় তখন ইংরাজকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। যদি কোনদিন ফ্রান্স ও ইতালি একত্র হইয়া ভূমধ্যসাগরে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন ইংরাজ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীকে বাধ্য হইয়া সাহায্য করিবে। ইওরোপে যতক্ষণ কোন রাজশক্তি ইংরাজের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরাজ কোনদিন কাহারও সহিত গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চায় নাই। কাজেই ইংরাজ ও ফ্রান্সের মধ্যে বর্ত্তমানে ঝগড়াটা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; বরং জার্ম্মানীতে হিটলারের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সহানুভূতি ফ্রান্সের দিকে যাওয়া সম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের শেষে বহু ইংরাজ নেতা জাপানের শক্তি খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়, এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে একত্র হইয়া স্থির করে যে জাপান চীনের কোন প্রদেশ অধিকার করিতে পারিবে না। কয়েক বৎসরের জন্য ইংরাজ

জাপানের শক্তি খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের নেতারা নানা উপায়ে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার একাংশ জাপানের আধিপত্যের মধ্যে আনিয়াছে। জাপান যে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে তাহাতে ইংলণ্ডের আপত্তির কিছু নাই। কারণ ইহার ফলে জাপান চীন এবং রুষিয়ায় শত্রুবৃদ্ধি করিয়াছে উপরন্তু আমেরিকার গণমতও তাহার বিরুদ্ধে গিয়াছে। জাপান নিজের সামরিক শক্তি, নৌ-শক্তি ও রাজ্যবিস্তার করিয়া ক্ষান্ত নহে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে জাপান ইংরাজকে এশিয়ার বাজারে পরাস্ত করিতেছে। কাজেই জাপানের ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং বিশ্বরাজনীতি পন্থা ইংরাজের সমূহ ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয়। ইংলণ্ডের সংবাদ-পত্রে, পার্লামেণ্টের আন্দোলনে সর্ব্বত্র দেখা যায় যে জাপান ইংরাজের ব্যবসায়ের ক্ষতি করিতেছে। ১৯১৪ সালে যেমন ইংরাজ জার্ম্মানীকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ১৯৩৩ সালে জাপান বহু ইংরাজ রাজনীতিকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে।

দূরদর্শী ইংরাজনেতারা প্রাচ্যে ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরে বিশাল নৌ-দুর্গ গঠন করিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিলাম যে ইংরাজের কয়েকটা খুব দ্রুত রণতরী সিঙ্গাপুরে আসিতেছে এবং সিঙ্গাপুরে বিশাল বায়ুযানের কেন্দ্র হইবে। ভবিষ্যতে যদি জাপানের সহিত ইংরাজের

বিবাদ হয় সে সময় ইংরাজ যাহাতে চীনের সাহায্য পাইতে পারে তাহার জন্য চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে বহু ইংরাজ নেতা বদ্ধপরিকর। একথা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের সাহায্যেরও আশা রাখে। যেমন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংরাজ রুষিয়ার সাহায্য লইতে দ্বিধা করে নাই ঠিক সেইভাবে ইংরাজ প্রয়োজন হইলে জাপানের বিরুদ্ধে রুষিয়ার সাহায্য লইবে। যদি কোন দিন ইংরাজ-জাপানে যুদ্ধ হয়, তখন ইংরাজ ভারতবর্ষের জনবল, ধনবল ও নানাপ্রকারের সাহায্য লইবে সে সম্বন্ধে ভুল নাই। বর্ত্তমানে ভারতের ব্যবসাদারেরা এমন কি মহাত্মা গান্ধীও জাপানের বিরুদ্ধে; কাজেই ইংরাজ যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের নিকট হইতে বিশেষভাবে সাহায্য পাইবে সে সম্বন্ধে ভুল নাই।

যতদূর বুঝিতে পারি ইংরাজ জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। একথা আবার বলি যে ইংরাজ "গায়ে পড়িয়া" জাপানের সঙ্গে ঝগড়া করিবে না। জাপান যদি এই দাবী করে যে তাহার নৌ-শক্তি ইংরাজের নৌ-শক্তির তুল্য হইবে তাহা হইলে ইংরাজ নেতারা উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে এবং খুব সম্ভবতঃ আমেরিকা তাহাদের মতে সায় দিবে। তখন হইতেই ইংরাজ জাপানের মধ্যে প্রকৃত শত্রুতা বাড়িবে। ১৯১০ সালে যখন জার্ম্মানী দাবী করে যে সে তাহার ইচ্ছামত নৌ-শক্তি

বৃদ্ধি করে তখন প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ-জার্ম্মান শত্রুতা বাড়িতে থাকে ; ঠিক সেই ভাবে জাপান যদি ইংরাজের নৌ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইংরাজ-জাপান বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে।

ইংরাজ কখনো নিজে যাচিয়া জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না ; হয়ত চীন ও জাপানে কোন বিষয় লইয়া যুদ্ধ বাধিবে তখন হয়ত ইংরাজ চীনের 'স্বাধীনতার' জন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবে। ইহা খুবই সম্ভব যে চীনকে জাপানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইতে পারে।

মোট কথা এই যে বর্ত্তমানে ইংরাজের পক্ষে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভয়াবহ এবং জাপানের শক্তি যদি শীঘ্র খর্ব্ব না হয় তাহা হইলে জাপান ভবিষ্যতে ইংরাজের সমূহ ক্ষতি করিতে পারে ; কাজেই বাধ্য হইয়া স্বার্থরক্ষার জন্য জাপান-দমন ইংরাজ রাজনীতিকদের পররাষ্ট্রনীতির একটা প্রধান পন্থা হইবে। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পররাষ্ট্র-পন্থার পরিবর্ত্তন হয়। যদি ইংরাজ ও জাপান আবার Anglo-Japanese Alliance স্থাপন করিতে পারে তাহা হইলে এ শত্রুতা দূর হইতে পারে। জাপান ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী এবং কোন উপায়ে বন্ধ হইতে পারে না, একথা বলিতেছি না।

[পঁচিশ]

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপানের পররাষ্ট্র পন্থা কি ? ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে চীন-জাপানের যুদ্ধের পর (১৮৯৪-৯৫) জাপান যখন মাঞ্চুরিয়ার একাংশ অধিকার করে তখন রুষিয়া, জার্ম্মানী ও ফ্রান্স একত্র হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জাপান একলা রুষিয়া, জার্ম্মান, ফ্রান্স ও চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে পরাজিত হইবে, কাজেই বাধ্য হইয়া লাইটুং উপদ্বীপ (মাঞ্চুরিয়ার অংশ) চীনকে ফেরত দেয়। কিন্তু তাহার পর ঈঙ্গ-জাপানী বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া রুষিয়াকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়ার একাংশে ও কোরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে জাপান জার্ম্মানীকে চীন হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে; কিন্তু ওয়াশিংটন কনফারেন্সের ফলে জাপান একঘরে হইয়া পড়ে। ১৯৩৩ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করে।

জাপানি রাজনীতিবিশারদেরা মনে করেন যে ভবিষ্যতে চীন, রুষিয়া, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একত্র হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যাইতে পারে। কাজেই জাপানের আত্ম-রক্ষার জন্য চীনের শক্তি নাশ এবং এশিয়া মহাদেশে অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের শক্তি বিস্তার করা দরকার। কারণ

এই পন্থার দ্বারা চীন ও রুষিয়ার সৈন্যের সম্মিলনের পথ বন্ধ হইবে এবং মাঞ্চুরিয়া হইতে জাপান সহজে চীনের ও রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে। মাঞ্চুরিয়ার মাল-মশলা দিয়া জাপানের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করা খুব সহজসাধ্য হইবে।

বর্ত্তমানে চীন একলা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না তাহা সকলেই জানেন। জাপান ইহা জানে যে বর্ত্তমান অবস্থায় সোভিয়েত রুষিয়া নানাবিষয়ে জাপান অপেক্ষা হীনবল এবং যদি জাপান ও রুষিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে ইওরোপে রুষিয়ার বিপদের সম্ভাবনা—যথা ইউক্রেনে বিপ্লব—কাজেই রুষিয়ার শক্তি বাড়িবার পূর্ব্বে জাপান মাঞ্চুরিয়ার রেল ইত্যাদি মাঞ্চুকুয়োর ভিতর দিয়া নিজের হাতে আনিতে চায়।

জাপান যে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছে উহা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রুষিয়া সুদৃষ্টিতে দেখে না; কিন্তু বর্ত্তমানে ইংলণ্ড, আমেরিকা বা রুষিয়া "যেচে পড়ে" জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজি নয়। জাপান এই অবস্থায় ভবিষ্যতের বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় সামরিকশক্তি ও বায়ুযানশক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেছে। দরকার হইলে জাপান যাহাতে চীনের ও রুষিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমেরিকা বা ইংরাজ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় তাহা

হইলে প্রধান শক্তি-পরীক্ষা জলযুদ্ধে হইবে ; কাজেই জাপান আপনার নৌ-শক্তি বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতেছে।

জাপান একলা চীন, রুষিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত নয় এবং এই চারি রাজশক্তি যদি জাপানের বিরুদ্ধে যায় এবং জাপান যদি অন্য কোন রাজ-শক্তির নিকট সাহায্য না পায় তাহা হইলে জাপানের পরাজয় নিশ্চিত। জাপানের একদল নেতা তজ্জন্য বর্ত্তমানে চীনের সহিত যাহাতে জাপানের শত্রুতার শেষ হয় এবং অতি সত্বর চীন ও জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে আমেরিকার সহিত জাপানের বন্ধুত্ব হয় এবং রুষিয়ার সহিত শত্রুতা বৃদ্ধি না হয় তাহার জন্যও জাপান বিশেষ যত্নবান।

১৮৯৫ সালে জাপান বাধ্য হইয়া লাইটুং দ্বীপ চীনকে ফেরত দেয়। পুনরায় ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের পর জাপান বাধ্য হইয়া চীনকে সানটুং রেলপথ ও সিংটাও বন্দর ফেরত দেয়। ১৯৩২ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। জাপান এখন হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। খুব সম্ভব ১৯৩৬ হইতে ১৯৪০এর মধ্যে প্রাচ্যে একটা যুদ্ধ হইবে এবং সেই সময় ইওরোপেও যুদ্ধ হইবে। এই যুদ্ধে জাপান ও এসিয়াস্থ রাজশক্তিগণ জড়িত হইয়া পড়িবে। এই যুদ্ধের ফলে জাপানের, ফ্রান্সের অথবা এসিয়ার নব অভ্যুদয় হইবে একথা বলা দুষ্কর।

[ছাব্বিশ]

বর্ত্তমানে সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্রনীতি পন্থা কি? রুষিয়ায় বিপ্লব আনিবার জন্য লেনিন্, ট্রটস্কি ষ্ট্যালিন ইত্যাদি নেতারা জার্ম্মানীর সাহায্য গ্রহণ করে। বৈপ্লবিক সোভিয়েত রুষিয়াকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া জার্ম্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। উহা রাপোলোর সন্ধি দ্বারা সাধিত হয়। ঐ সময় ফ্রান্স, এবং তাহার অনুগত পোলাণ্ড, জেকোশ্লাভকিয়া ও রুমানিয়া, ইংলণ্ড ও জাপান সোভিয়েত রুষিয়ার বিরুদ্ধে ছিল। জার্ম্মানীর সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সোভিয়েত রুষিয়ার নেতারা বিশেষতঃ লেনিন্ ও চিচিরিন মনে করিয়াছিলেন যে তুর্কি, পারস্য, আফগানিস্থান ও চীনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এসিয়াতে ভীষণ ভাবে ইংরাজ বিদ্বেষ প্রচার করিতে পারিলে ইংরাজ সহজে এসিয়ার দিক হইতে সোভিয়েত রুষিয়া আক্রমণ করিতে পারিবে না। রুষিয়া প্রথমে ইংরাজের ও গ্রীসের বিরুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করে, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পর পারস্যের উত্তরাংশে জারিষ্ট রুষিয়া যে সমস্ত সত্ত্ব ইংরাজের সহিত গুপ্ত সন্ধি করিয়া (Anglo-Russian Entente) পাইয়াছিল তাহা সোভিয়েত রুষিয়া ফেরত দেয় এবং পারস্যের জাতীয়তাবাদী নেতারা যাহাতে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহার জন্য

তাহাদের বিশেষরূপে সাহায্য করে। উহার ফলেই পারস্য পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে; এবং সোভিয়েত রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সন্ধি করে। সোভিয়েত রুষিয়া আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিল। আফগানিস্থান কেবল নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; আফগান সৈন্য ভারতের উত্তর পশ্চিমসীমা আক্রমণ করে; এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতা মানিয়া লয়। চীনের সহিত সোভিয়েত রুষিয়া সন্ধি করে এবং চীনে যে বৈদেশিকদের বিশেষ সত্ত্বাধিকার (Extra-territoriality Rights) ছিল উহা ত্যাগ করে। যখন ডাক্তার সান ইয়াং সেন চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতে-ছিলেন তখন সোভিয়েত রুষিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। চীনে ইংরাজের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন ও বয়কটের মূলে সোভিয়েত রুষিয়ার সাহায্য ছিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত রুষিয়া জাপানের সহিত সন্ধি করে এবং জাপানের মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষ সত্ত্ব মানিয়া লয়। রুষিয়ার নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জাপান যাহাতে ইংরাজের সঙ্গে যোগদান না করে। ঐ সময় অ্যাংলো-জাপানিস্ সন্ধি রদ হওয়ায় জাপান রুষিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিতে প্রস্তুত ছিল কাজেই রুষিয়ার নেতাদের পন্থা সফল হয়। এসিয়ায় তুর্কি হইতে চীন পর্য্যন্ত সোভিয়েত রুষিয়ার বৈদেশিক আক্রমণের ভয় দূর হয়। সোভিয়েত

রুষিয়ার নেতারা ট্রট্স্কির পরিচালনায় বলশালী সামরিক শক্তি গঠন করিতে থাকে এবং বিভিন্নদেশে যাহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করে।

এই সময়ের মধ্যে আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিয়া এবং সোভিয়েত রুষিয়ায় অন্তর্বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিয়া সোভিয়েত নেতারা ইওরোপের অন্যান্য রাজ শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে যত্ন করে। এবিষয়ে প্রথমে ইতালি ও সোভিয়েত রুষিয়ার ব্যাপক সন্ধি হয়। ক্রমশঃ ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অন্যান্য রাজশক্তি সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের সহিত পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সম্পর্ক (Diplomatic relations) স্থাপন করে।

সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের প্রথমে ভয় ছিল যে পোলাণ্ডের তরফ হইতে বা রুমানিয়ার তরফ হইতে ইওরোপীয় রাজ-শক্তিরা রুষিয়া আক্রমণ করিতে পারে; কাজেই এই ভয় দূর করিবার জন্য তাহারা নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। জার্ম্মানীতে নাৎসি বিপ্লবের পূর্ব্বে দক্ষ জার্ম্মাণ সামরিক নেতারা সোভিয়েত রুষিয়ার সৈন্যদলকে শিক্ষিত করিবার জন্য সাহায্য করে। জার্ম্মানীতে হিট্লার-বিপ্লবের পর হইতে ফ্রান্সের জার্ম্মানী ভীতি বাড়িয়াছে কাজেই যাহাতে ফ্রান্স ও তাহার বন্ধুবর্গ, পোলাণ্ড ও রুমানিয়া, রুষিয়ার সহিত শত্রুভাবাপন্ন না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করে। উহার ফলে ঐ রাজশক্তিগণের সহিত সোভিয়েত রুষিয়া অনাক্রমণ

সন্ধি (Nonaggression Pact) করিয়াছে। আজ রুষিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ভাব নাই কারণ রুষিয়া বুঝিয়াছে জার্ম্মানী বল্‌টিক প্রদেশে ও রুষিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আত্মবিস্তার করিতে চায়। রুষিয়া আরও বুঝে যে যদি কোন দিন জাপানের সহিত রুষিয়ার কোন যুদ্ধ হয় তখন জার্ম্মানী তাহার বিরুদ্ধে যাইবে। কাজেই রুষিয়া ফ্রান্স ও তাহার বন্ধুদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছুক।

রুষিয়ার নেতারা চায় শান্তি। রুষিয়া যাহাতে নিজের দেশের শিল্প ও সামরিক শক্তির উন্নতি করিতে পারে তাহার জন্য সময় চায় এবং শক্তিশালী রাজশক্তির সাহায্যও চায়। কাজেই সম্প্রতি যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্র-সম্বন্ধ স্থাপন হইয়াছে তাহা সোভিয়েতের পক্ষে খুব লাভজনক।

ইতিপূর্ব্বে রুষিয়া লীগ্ অফ নেশনের সভ্য হইতে রাজি হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সোভিয়েত রুষিয়া লীগ্ অফ নেশনের বিরুদ্ধে নয়। জাপান ও জার্ম্মানী লীগ অফ নেশনের বাহিরে থাকে তাহা হইলে রুষিয়া হয়ত ভবিষ্যতে উহার সভ্য হইতে পারে।* মোট কথায় সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে খুব বেশী ভয়ের কারণ নাই।

---

* বর্ত্তমানে জাপান ও জার্ম্মানী লীগ পরিত্যাগ করিয়াছে তাই রুষিয়া উহাতে যোগ দিয়াছে। —প্রকাশক

জাপান, জার্ম্মানী ও ইংলণ্ড সোভিয়েত রুষিয়াকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয় এবং ঐ তিন রাজশক্তি কয়েকটা বিষয়ে সোভিয়েত রুষিয়ার বিরুদ্ধে। তবু ইংলণ্ড সোভিয়েত রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় না বরং তাহার সহিত কোন প্রকার রফা করিয়া যদি রুষিয়াতে নিজের ব্যবসা বাড়াইতে পারে তাহা করিতে প্রস্তুত। জার্ম্মানী বর্ত্তমানে ফ্রান্সের সহিত বিশেষ রূপে জড়িত; এবং জার্ম্মানী যদি সোভিয়েত রুষিয়াকে আক্রমণ করিতে যায় তাহা হইলে জার্ম্মানী হয়ত ফ্রান্স ও তাহার বন্ধুদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কাজেই রুষিয়ার জার্ম্মানী ভীতি কম। সোভিয়েত রুষিয়ার প্রকৃত ভয়ের কারণ জাপান; তবে জাপান রুষিয়াকে আক্রমণ করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। কাজেই সোভিয়েত রুষিয়া আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এসিয়ার বিশেষতঃ ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা খুব সোভিয়েত রুষিয়াভক্ত এবং তাঁহারা মনে করেন যে একদিন সোভিয়েত রুষিয়ার সাহায্যে ভারত স্বাধীন হইবে। ইহা একেবারে অসম্ভব। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য সোভিয়েত রুষিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে একথা কেবল বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে অজ্ঞ লোকেই বিশ্বাস করিবে। বড় জোর সোভিয়েত রুষিয়ার নেতারা চিন্তা করে যে যদি কোন দিন ইংরাজ-রুষিয়ায় যুদ্ধ হয়,

সেই সময় ইংরাজ যাহাতে ভারতীয় সৈন্য রুষিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার না করিতে পারে তাহার জন্য ভারতে চেষ্টা করিতে পারে। সোভিয়েত নেতারা বিশ্বব্যাপী শ্রমিক বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করেন সত্য; কিন্তু যদি ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিলে তাঁহাদের নিজের দেশের কল্যাণ হয় তাহার জন্য তাহারা ভারতীয় মজুরদের ভুলিয়া যাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। কাজেই স্থান কাল ও পাত্র ভেদে সোভিয়েত রুষিয়ার পররাষ্ট্র পন্থার অন্যান্য সব দেশের ন্যায় পরিবর্ত্তন সম্ভব।

যদিও অতীতে ইংরাজ অনেকবার রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে তথাপি ১৯১৪ সালে ইংরাজ ও রুষিয়া একত্র হইয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভবিষ্যতে যদি আবার রুষ-জাপান যুদ্ধ হয় তখন হয়ত ইংরাজ রুষিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে এবং ভারতবাসীরা ইংরাজ ও রুষিয়ার হইয়া যুদ্ধ করিবে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

রুষিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ যে নিশ্চিত একথা বলা সম্ভব নয়। রুষিয়া ও জাপানে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও স্থাপিত হইতে পারে। রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর (১৯০৪-৫) রুষিয়া ও জাপানের মধ্যে ক্রমশঃ খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ১৯১০ সালে রুষিয়া ও জাপানের মধ্যে এক গুপ্ত সন্ধি হয় যে উভয়ে মিলিয়া মাঞ্চুরিয়ায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবে। যদি রুষিয়া কোন কারণে জাপানের সহিত আবার

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সন্ধি স্বাক্ষর করে তাহা হইলে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিবে।

মোট কথা এই যে সোভিয়েত রুষিয়া বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা সুবৃহৎ অংশ (Important factor) এবং বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েত রুষিয়ার প্রতিপত্তি বাড়িবার দিন শীঘ্র আসিতেছে।

[সারাংশ]

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি? এ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলিতে চাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যদিও অপরাপর রাজশক্তির (ফ্রান্স, স্পেন, হলাণ্ড ইত্যাদির) সাহায্যে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করে, তথাপি প্রেসিডেন্ট জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সময় হইতে আমেরিকার লক্ষ্য ইওরোপের রাজশক্তিগুলির বাদ বিসম্বাদের মধ্যে না যাওয়া। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র নিজের দেশে নিজের উন্নতিসাধন করিতেই সন্তুষ্ট। গত ১৫৬ বৎসরের মধ্যে যখনই আমেরিকা ইওরোপের কোন রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে তখন কেবল তাহা তাহার নিজের অধিকার রক্ষার জন্য। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চায় যে ইওরোপের কোন রাজশক্তি যেন আমেরিকায় রাজত্ব বিস্তার করিতে না পারে। সে চায় যে দুনিয়ায় সর্ব্বত্র সমান ভাবে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের পর হইতে আমেরিকার আদর্শ যাহাতে জগতে শান্তি বিস্তার হয়। আমেরিকা আত্ম-রক্ষার জন্য কাহার সাহায্য চায় না; কিন্তু ইওরোপের রাজশক্তিগণের মধ্যে সকলেই আমেরিকার সাহায্য চায়। এসিয়া ও ইওরোপে আমেরিকার সহিত সকল রাজশক্তির সৌহার্দ্দ্য আছে; এক জাপানের সহিতই নানা বিষয়ে মনোমালিন্যের কারণ ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্ট চান যে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। আমেরিকা যদি মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের নূতন অধিকার মানিয়া লয়,—যদি চীন-জাপানের বর্ত্তমান বিবাদ বিসম্বাদে চীনের পক্ষাবলম্বন না করে এবং আমেরিকা যদি তাহার নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে একত্র না করে এবং আমেরিকায় জাপানীদের সত্ত্ব ও অধিকার অন্য বৈদেশিকদের সমান করে তাহা হইলে আমেরিকা-জাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়িতে পারে।

বর্ত্তমানে অনেকে মনে করেন যে আমেরিকার ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ নিশ্চিত; কিন্তু আমার মনে হয় যে আমেরিকার ও জাপানের নেতারা যাহাতে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্টের পররাষ্ট্রনীতি হইতেছে জগতে শান্তি-বিস্তারের জন্য অন্যান্য রাজশক্তির সহিত মিলিয়া কাজ

করা এবং আমেরিকার যে সব কার্য্যপ্রণালী অন্য রাজশক্তির মধ্যে সন্দেহের সঞ্চার করে সে সব কার্য্যপ্রণালী পরিত্যাগ করা। প্রেসিডেন্ট রুস্‌ভেল্ট আদেশ দিয়াছেন যে আমেরিকার আট্‌লান্টিক মহাসাগরের নৌ-বাহিনী, যাহা প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আছে, তাহা পুনরায় আট্‌লান্টিক মহাসাগরে ফিরিয়া যাইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি জাপানের সহিত যাচিয়া ঝগড়া করিতে প্রস্তুত নহেন।

আমেরিকা ফিলিপিন দ্বীপকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত এবং আমার বিবেচনা হয়ত ১৯৩৫-৩৬ সালে ফিলিপিন দ্বীপকে স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং ফিলিপিন যাহাতে অন্য রাজশক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয় তাহার জন্য ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স ইত্যাদি রাজশক্তির সহিত একটা সন্ধি করিবে। আমেরিকা ফিলিপিনকে স্বাধীনতা দিলে, তাহার ফলে জাপানের সহিত আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত এশিয়াতে ও দক্ষিণ আমেরিকাতে আমেরিকার গৌরব ও প্রতিপত্তি বাড়িবে।

আমেরিকা চীনের বন্ধু এবং চীন যাহাতে স্বাধীনতা না হারায় তাহার জন্য আমেরিকার বিশেষ সহানুভূতি আছে। আমেরিকা চায় যে চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়; তাহাতে তাহার কোন ভয় নাই। চীন-জাপানে বিগ্রহ ও যুদ্ধে আমেরিকার ভয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমেরিকা

চায় যে চীন ও জাপানের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হউক।

সম্প্রতি আমেরিকা সোভিয়েত রুষিয়ার গভর্ণমেণ্টের সহিত পররাষ্ট্র সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে বলিয়া অনেক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমেরিকা জাপানের বিপক্ষে সোভিয়েত রুষিয়াকে সাহায্য করিবে। আমেরিকা রুষিয়ার হইয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবে এটা বিশ্বাস হয় না; তবে ১৯০৪-৫এ রুষ-জাপানের যুদ্ধের সময় আমেরিকার সহানুভূতি যেমন জাপানের প্রতি ছিল, ভবিষ্যতে রুষ-জাপান যুদ্ধ লাগিলে আমেরিকার সহানুভূতি রুষিয়ার দিকে আসিতে পারে।

জাপান ও আমেরিকায় যুদ্ধ হইলে এই দুই শক্তির ক্ষমতা নষ্ট হইবে এবং ইংরাজের, জার্ম্মানীর ও অন্যান্য রাজ শক্তির লাভ হইবে। অর্থনৈতিক ও ব্যবসাক্ষেত্রে জাপানে ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব কম। এশিয়াতে জাপান ও ইংরাজের মধ্যে ব্যবসা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যত্র ইংরাজ ও আমেরিকার মধ্যে আর্থিক ও ব্যবসা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। কাজেই জাপান ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবসায় নিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা কম।

আমেরিকা ইওরোপের রাজশক্তির বাদবিসম্বাদে ঢুকিতে প্রস্তুত নয়। গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে আমেরিকা যে ক্রোর

ক্রোর পাউণ্ড টাকা ধার দেয় তাহা ফেরত পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমেরিকা ঠেকিয়া শিখিতেছে যে অন্যের ঝগড়ায় না ঢোকাই ভাল।

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকা অনেকবার দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে বিপ্লবের সময় হস্তক্ষেপ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্ট একেবারে খোলাখুলি বলিয়াছেন যে দক্ষিণ আমেরিকায় শান্তি রক্ষা করা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একলার দায়িত্ব নয়; কাজেই যুক্ত রাষ্ট্র ভবিষ্যতে তাহার নৌ-বাহিনী বা সামরিক শক্তির দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের মধ্যে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করিবে না।

বর্ত্তমানে আমেরিকার আভ্যন্তরিক অবস্থা খারাপ এবং আমেরিকা নিজের ঘর সামলাইবার জন্য ব্যস্ত। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমেরিকা শক্তিহীন। আমেরিকা আবার নিজের নৌ-শক্তি, বায়ুযান শক্তি ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছে। ১৯৩৫-৩৬এ যখন ওয়াশিংটন ও লণ্ডন নৌ-বাহিনী সম্বন্ধীয় সন্ধির মেয়াদ শেষ হইবে তখন আবার একটা সভা হইবে এবং তখন আমেরিকা বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে। ঐ পন্থা যে কি হইবে তাহা বলা দুষ্কর। তবে একথা বলা যায় যে আমেরিকা নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ পরিকর হইবে। আমেরিকা কোন রাজশক্তির সহিত যুদ্ধ বাধাইবার ছুঁতা খুঁজিতেছে না।

আমেরিকা চায় শান্তি ; তবে যদি আমেরিকাকে অন্য কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয় তাহা হইলে আমেরিকা সহজে এবং হঠাৎ এই পন্থা অবলম্বন করিবে না।

(আভাস)

বর্ত্তমানে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে চীনের পররাষ্ট্র পন্থা কি? বর্ত্তমানে চীনের অবস্থা বড় শোচনীয়। চীনের মধ্যে চারটি দল পরস্পরের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ করিতেছে। এই চার দল, (১) কম্যুনিষ্ট (২) নান্‌কিন্ গভর্ণমেণ্টের দল, যাহার সহিত কয়েকজন সামরিক নেতারা মিলিয়াছে এবং যাহার প্রধান নেতা জেনারেল চিয়াং কাইসেক (৩) চিয়াং কাইসেকের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্টের দল এবং (৪) চাইনিজ সোস্যালিষ্ট দল। এই চারি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জাতীয় শক্তিক্ষয় করিতেছে, কাজেই পররাষ্ট্র রাজনীতি ক্ষেত্রে চীন শক্তিহীন। যতদিন এই অন্তর্বিগ্রহ শেষ না হইবে, ততদিন চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্তর্বিগ্রহ জাতীয় পতনের প্রধান কারণ।

কম্যুনিষ্ট চৈনিকদের লক্ষ্য চীনে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা এবং এ বিষয়ে তাহারা সোভিয়েত রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায়। সোস্যালিষ্ট চৈনিকরা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে তবে তাহারা শক্তিহীন কাজেই তাহাদের পন্থা বড় আসে যায় না। ক্যাণ্টন দলের

নেতারা যে কোন উপায়ে চিয়াং কাই সেকের পতনের জন্য বদ্ধপরিকর এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাহারা কম্যুনিষ্টদের সহিত মিলিতে প্রস্তুত আছে। চিয়াং কাই সেক চায় যে তাহার নেতৃত্বে সমস্ত চীন এক মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র হইবে। কাজেই চিয়াং কাই সেকের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে একদিকে তাহাকে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে অপরদিকে ক্যান্টন গভর্ণমেণ্ট যাহাতে খুব বলশালী হইয়া তাহার পতনের কারণ না হয় তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে।

বর্ত্তমানে চীনের পররাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা এই যে জাপানের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিলে জাপান আক্রমণ করিবে না এবং কোন্ উপায়ে মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

চীনের সমস্ত রাজনৈতিক দল চায় যে চীন কোন উপায়ে মাঞ্চুরিয়া ফেরত পায় কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম পন্থা ভিন্ন। চীনের কম্যুনিষ্টরা মনে করে যে একদিন রুষিয়া চীনের সাহায্য করিবে এবং তাহার ফলে জাপানের পতন হইবে। এক সময় চিয়াং কাই সেক বিশ্বাস করিয়াছিল যে হয়ত লীগ্ অফ্-নেশনের সাহায্যে চীন জাপানকে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে পরাজিত করিতে পারিবে। চীনের নেতাদের মধ্যে অনেকে এখনও ঐ পন্থার উপর বিশ্বাস করে। যত দূর বুঝা যায়, জেনারল চিয়াং কাই সেক্ ও ডাঃ ওয়াং চিং ওয়ে

(নান্‌কিন্‌ গভর্ণমেণ্টের নেতা) বিবেচনা করেন যে বর্ত্তমানে চীন অন্য কোন রাজশক্তির নিকট হইতে এমন সাহায্য পাইতে পারে না যাহার দ্বারা জাপানকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে পারে। কাজেই তাঁহারা এই বিশ্বাস করেন যে চীন বর্ত্তমানে জাপানের সঙ্গে কোন প্রকারে একটা রফা করিয়া নিজের আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্ন করুক। জেনারেল চিয়াং কাই সেকের এই পররাষ্ট্র পন্থা ক্যাণ্টনের দলের নেতারা অনুমোদন করে না এবং তাহারা বলে যে চীন ইংরাজ, আমেরিকা, রুষিয়া ও লীগ্‌ অফ্‌ নেশনের সাহায্যে যথা সময়ে জাপানকে পররাষ্ট্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরাজিত করিতে পারিবে।

জাপানীরা বুঝিতেছে যে যদি ক্যাণ্টন দলের জয় হয় তাহা হইলে একদিন হয়ত চীন, রুষিয়া, আমেরিকা ও ইংরাজ একত্র হইয়া জাপানের পতনের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে এবং তাহা জাপানের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রকাশ, জাপানের নেতারা চিয়াং কাই সেকের নিকট এই প্রস্তাব গুপ্তভাবে করিয়াছে যে যদি তিনি চীন-জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং পররাষ্ট্রনৈতিক স্থাপনের পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে জাপান চিয়াং কাইসেকের প্রতিপত্তি চীনে যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

যদি চীন ও জাপান কোন উপায়ে বন্ধুত্ব করিতে পারে তাহা হইলে সমস্ত এসিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে পারে।

মোট কথা হইতেছে যতদিন চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত চীনকে আত্মরক্ষার জন্য অন্য রাজশক্তির সাহায্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে চীন কেবল জাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যস্ত কাজেই অন্যান্য রাজশক্তি যাহারা চীনের রাজ্যে তাহাদের প্রতিপত্তি বাড়াইতে চায় তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া নাই। ইংলণ্ড তিব্বতের মধ্য দিয়া সেচুয়ানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অনেকের মতে তিব্বতি সৈন্য সম্প্রতি যে চীন আক্রমণ করিয়াছিল তাহাতে ইংরাজের সাহায্য ছিল। ফ্রান্স ইন্দোচায়নার দিক হইতে হইতে চীনের ইউনান প্রদেশে নিজের শক্তি বাড়াইতেছে। সোভিয়েত রুষিয়ার সৈন্য মধ্য এসিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় আত্মশক্তি বাড়াইতেছে। বর্ত্তমানে চীনের অবস্থা অন্ধকার। যতদিন চীনে অন্তর্বিদ্রোহ চলিবে ততদিন চীনের কল্যাণকর পররাষ্ট্রনীতি পন্থা অবলম্বন করা অসম্ভব।

[ঊনত্রিংশ]

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়? এই প্রশ্নটা শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং কেহ বা বলিবেন যে "বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কোথায়, এ কথা বিবেচ্য ; কিন্তু বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায় এ কথা বাতুলের প্রশ্ন।" কেহ বা বলিবেন যে আমি প্রাদেশিক ভাবে মত্ত হইয়া ভারতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালার দেশভক্তরা ভারতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন সেটা সুখের কথা কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে বাঙ্গালার উন্নতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নির্ভর করে। বাঙ্গলার দায়িত্ব বড় বেশী কাজেই যে বোঝা বহিবে তাহার যাহাতে শক্তি হয়, সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা দরকার।

ভারতের পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালা একটা বিশেষ বৃহৎ স্থান অধিকার করে এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালার দায়িত্ব বাড়িবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সংলগ্ন। বাঙ্গালা ও আসামের প্রান্ত দিয়া চীনের সহিত সংস্রব। বাঙ্গালার উত্তরে তিব্বত দিয়া চীন ও রুষিয়ার সহিত সম্পর্ক হইতে পারে। একদিন বাঙ্গলার নৌ-বাহিনী ভারত মহাসমুদ্র তথা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রে বিরাজ করিবে ; কিন্তু

আজ ইংরাজ রাজনীতিবিশারদেরা বাঙ্গলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে একটা নূতন North-Eastern Frontier Province গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের আয়তন রুষিয়া ব্যতীত সমস্ত ইওরোপের সমান। বাঙ্গলার আয়তন ইওরোপের বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা বড়। জন সংখ্যায় বাঙ্গালা সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কেবল চীন, রুষিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্ম্মানী—জন সংখ্যায় বাঙ্গালার চেয়ে বড়। জন সংখ্যায় বাঙ্গালা—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালির অপেক্ষা বড়। বাঙ্গালার ধনশক্তি, জনশক্তি, বিদ্যা-বুদ্ধিশক্তি কম নয়। বাঙ্গলার সামরিকশক্তি কম নয়, কিন্তু উহা বিকাশের সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তার হইলে তাহারা গুর্খা বা জাপানিদের চেয়ে কোন অংশে হেয় হইবে একথা আমি বিশ্বাস করি না।

আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্ত্তন হইবে এবং ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করিবে বলিয়া আশা হয়; কিন্তু বাঙ্গালীদের এবিষয়ে দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কাজেই বাঙ্গলার নেতাদের জিজ্ঞাসা করি "বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গলার স্থান কোথায়"?

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তাহা হইলে একদিন

বাঙ্গালীর রাজশক্তি ফ্রান্স বা ইতালির তুল্য হইবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে আমায় বলিবেন যে "আপনি প্রায় ৩০ বৎসর বাঙ্গালা ছাড়া, কাজেই বাঙ্গলার অবস্থা জানেন না এবং আজ কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছেন!!" কথাটা সত্য—আমি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিতেছি! যে বাঙ্গালা একদিন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আপনার জাতীয় গৌরবের স্থান দখল করিবে সেই বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিতেছি। হয়ত এই স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হইবে।

যখন আমি বলি যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব লইতে হইবে, তখন কেহ যেন না মনে করেন যে ঐ সময় ভারতবর্ষ ও ইংরাজের মধ্যে কোন প্রকারের শত্রুতা বা গণ্ডগোল হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ এবং ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব নয়। যত দিন ভারতবাসী শক্তিশালী না হইবে ততদিন ইংরাজ ও ভারতের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ভারতের নেতারা যদি প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ভুলিয়া জাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য একত্রিত হইতে পারেন তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজ রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষের সমস্ত দাবী নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন। দলাদলিতে দুর্ব্বল,

রাজনৈতিক দূরদর্শিতাহীন জাতির সহিত কে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে? ইংরাজ রাজনীতিকেরা মূর্খ নহেন—তাঁহারা জানেন যে ভারতবাসীর সৌহার্দ্দ্য তাঁহাদের শিল্প বাণিজ্য, সামরিক শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। শক্তিসেবক বাঙ্গালী, তোমার গুরু দায়িত্ব পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রকৃত উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হও!

বন্দেমাতরম্ !!